হযরত আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.) — এক মহান খোদা-প্রেমিক

মূল: আদম হানি ওয়াকার (ইউকে)

ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

মূল লেখাটি প্রকাশিত হয় *রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স*-এর নভেম্বর, ২০০৭ সংখ্যায়। এর বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ'র মুখপত্র *মাসিক আহ্বান*-এ ২০০৮ সাল থেকে এবং আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর মুখপত্র *পাক্ষিক আহমদী*-তে, ২০১০ সাল থেকে। এখানে এটি পরিমার্জিতরূপে উপস্থাপন করা হলো:

মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:[১]

'আবু বকরের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমার উম্মতের সবার জন্য ফরজ।'

ভূমিকা

হযরত আবু বকরের (রা.) অনেকগুলো আরবী উপাধির (কুনিয়া) একটি হলো 'আবু বকর'। কিন্তু, তার আসল নাম ছিল আব্দুল কা'বা [কা'বার দাস]। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার নামকরণ করেন 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি কোহাফা উসমান ইবনে আমের ইবন আমর ইবন কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তায়েম ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব আল-কারশী আল তায়মী'। তার সমসাময়িক লোকেরা আরও অনেক উপাধিতে তাকে ভূষিত করেছিল। এসব উপাধি বা নামকরণ থেকে আবু বকরের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীরভাবে জানা যায়, যা তারা উপলব্ধি করেছিল। উপাধিগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে 'আতীক', যার আক্ষরিক মানে হচ্ছে মহানুভব বা এ রকম ব্যক্তি যিনি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি বা প্রভাব থেকে মুক্ত। তার এ ধরনের নামপ্রাপ্ত হওয়ার পেছনে অসংখ্য কারণ রয়েছে। যেমন, একটি হাদীসে বলা হয়েছে:[২]

'আবু বকর, তুমি তাদেরই একজন যাদেরকে আল্লাহ্ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করেছেন।'

তিনি 'আস-সিদ্দিক' নামেও পরিচিত ছিলেন। এই শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'সত্যবাদিতা'। আক্ষরিকভাবে, এই শব্দটি দিয়ে এমন লোককে বুঝানো হয় যিনি সবসময় সত্য কথা বলেন।

হাদীস সংকলন গ্রন্থ সহী বুখারীতে আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) একবার হযরত আবু বকর, উমর এবং উসমান-সহ উহুদ পাহাড়ের চুড়ায় উঠছিলেন, তখন তিনি বলেন:[৩]

'হে উহুদ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাক। কারণ, তোমার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এক জন নবী, এক জন সিদ্দীক (হযরত আবু বকর) এবং দু'জন শহীদ (হযরত উমর ও হযরত উসমান)।'

এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরবীতে লিখেন:[৪]

'আমার প্রভু এটা আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, সিদ্দীক (আবু বকর রা.) এবং ফারুক (উমর রা.) এবং উসমান মুত্তাকী ও মু'মিন বান্দা। তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহভাজন।

আমাকে জানানো হয়েছে যে, তারা মুত্তাকী। যারা তাদেরকে আঘাত করে তারা আল্লাহ্‌কে আঘাত করে এবং তারা সীমালঙ্ঘনকারী।'

এরপর আস-সিদ্দীক-এর গভীর অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) তার জ্ঞানের গভীরে মনোনিবেশ করেন। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনি (আ.) আমাদের সামনে উজ্জ্বল মণিমুক্তার ন্যায় জ্ঞান দান করেন। তিনি লিখেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর ফানাফির রসূল-এর [অর্থাৎ, রসূল (সা.) এর ভালোবাসায় পরিপূর্ণভাবে বিলীন হওয়ার] মাধ্যমেই কেবল নবুওয়ত লাভ করা যেতে পারে। মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন:[৫]

'... নবুওয়তের সকল দরোজা বন্ধ। শুধু সিরাতে সিদ্দীকির (অর্থাৎ, রসুল সা.-এর মাঝে নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলার) পথ খোলা।'

হযরত আবু বকরের আরো কিছু উপাধি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'আস সাহিব' (সঙ্গী/সহচর) এর চেয়ে বেশি সম্মানের আর কোনোটিই নয়। এই উপাধিটি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, হেরা পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণের সময় হযরত আবু বকর কাঁদছিলেন। তখন রসূল করীম (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন কাঁদছো? জবাবে আবু বকর (রা.) বললেন:[৬]

'আমি আমার জীবনের জন্য কাঁদি না। হে আল্লাহ্‌র রসূল, যদি আমি মারা যাই, তাহলে একজন লোকের জীবনই শুধু যাবে। কিন্তু, যদি আপনি মারা যান, তাহলে ইসলামের মৃত্যু ঘটে যাবে, পুরো মুসলিম উম্মাহর মৃত্যু হয়ে যাবে।'

এখানেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা একটি সান্ত্বনাদায়ক আয়াত নাজিল করেন যেন হযরত আবু বকরের উৎকণ্ঠা দূর হয়। এই আয়াতেই তাকে 'আস সাহিব'[৭] উপাধি দেওয়া হয়। আয়াতটি হচ্ছে:

"... তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুশ্চিন্তা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন'।"

(আত্ তাওবা, ৯:৪০ আয়াত)

এই অনুপম উপাধি লাভের মাধ্যমে, খাতামুন্নবীঈন হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর এতো ঘনিষ্ঠতা লাভের মাধ্যমে এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবু বকর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটি তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনার দ্বারাও বোঝা গেছে। তিনি সামান্যতম দ্বিধাও করেন নি সত্য গ্রহণে, সঙ্গে সঙ্গে মহানবীর দাবির প্রতি ঈমান এনেছেন এবং বয়'আতের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আবু বকরের বয়'আত নেওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশে বলেন:[৮]

"বস্তুত, যখন আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের প্রতি রসূল করে পাঠিয়েছেন, তোমরা বলেছো, 'তুমি মিথ্যাবাদী', কিন্তু আবু বকর বলেছে, 'তিনি সত্য কথাই বলেছেন'। এর পর সে আমাকে সহানুভূতি জানিয়েছে তার জীবন ও অর্থ-সম্পদ কুরবানির দ্বারা।"

পরিবার

হযরত আবু বকর (রা.) খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। তার বাবার নাম ছিল উসমান ইবনে আমার ইবনে আমর (রা.)। [এছাড়া তিনি আবু কোহাফা নামেও পরিচিত ছিলেন]। তার মায়ের নাম ছিল সালমা বিনতে সাখর ইবনে আমের ইবনে কা'আব ইবনে সা'আদ ইবনে তায়ইম (রা.)। [তিনি উম্মুল খায়ের নামেও পরিচিত ছিলেন]। হিজরতের আগে, ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে যেখানে তার মা ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেখানে তার বাবা মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মুসলমান হন নি। মক্কা বিজয়ের দিনই তার বাবা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকরের চার জন স্ত্রী ছিল। এদের গর্ভে তার ছয়টি সন্তান হয়। স্ত্রীরা হচ্ছেন, হযরত কাতিলাহ, হযরত উমমে রুমান, হযরত আসমা এবং হযরত হাবীবা। তার সন্তানরা হচ্ছেন, হযরত আবদুর রহমান (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.), হযরত মুহম্মদ (রা.), হযরত

আসমা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত উম্মে কুলসুম, যে কিনা জন্মগ্রহণ করেছে তার মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পর।

তার পরিবার ছিল নিঃসন্দেহে ঐশী নেয়ামতে ভূষিত। প্রথাগত ইসলামী চিন্তাধারা ও শাসনের বিকাশ ও সফলতার পেছনে তাদের ব্যাপক অবদান রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) এর পরিবার সেই সকল হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা চার প্রজন্ম ধরে রসুল (সা.) এর সাহাবী ছিল।

হযরত আবু বকরের বংশানুক্রমের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে যে-কেউ দেখতে পাবেন যে, তিনি (রা.) নবীদের বংশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বস্তুত, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সঙ্গে পারিবারিক ধারায় সম্পর্কযুক্ত, তার পাঁচ পুরুষ ঊর্ধ্বের দাদা হযরত তামিম এর দ্বারা। হযরত তামিম ছিল হযরত কুলাবের ভাই। হযরত কুলাবের অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

হযরত তামিম ও হযরত কুলাবের বাবা ছিল হযরত মুররাহ। এদের পূর্বপুরুষ হযরত আদনান।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর বংশানুক্রম:[৯]

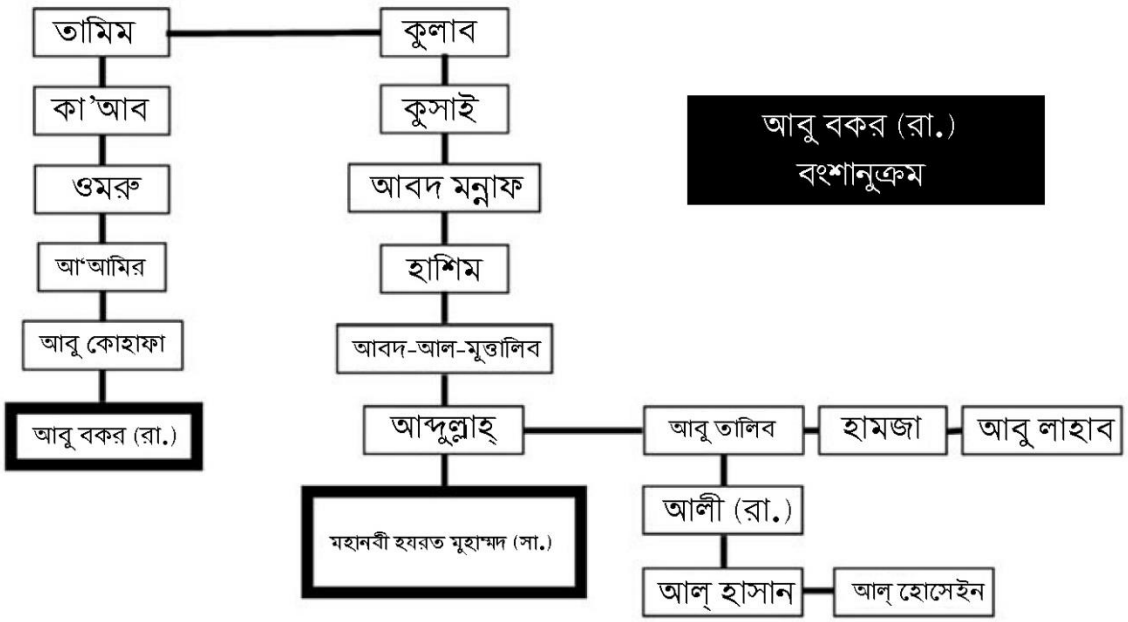

উপরে বর্ণিত বংশতালিকার সঙ্গে হযরত ইবনে হিশাম একমত। তিনি এটাকে আরও বিস্তৃত করেছেন, হযরত আদনান থেকে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত এটি নিয়ে গেছেন। তালিকাটি নিম্নরূপ:[১০]

'আদনান ইবনে উদ (উদাদ নামেও পরিচিত) ইবনে মুকাইইম ইবনে নহুর ইবনে তাইরাহ ইবনে ইয়ারুব ইবনে ইয়াশযুব ইবনে নবিত ইবনে (নবী) ইসমাঈল (আ.) ইবনে (নবী) ইব্রাহীম (খলীলুল্লাহ্) (আ.) ইবনে তারিহ [আজর নামেও পরিচিত] ইবনে নহুর ইবনে সরুঘ ইবনে রা'উ ইবনে ফালাখ ইবনে আইবার ইবনে সালাখ ইবনে আরফাখশাধ ইবনে সাম ইবনে (নবী) নূহ (আ.) ইবনে লেমক ইবনে মুত্তাসালাখ [মথুশেলহ] ইবনে আখনখ/হনোক [তিনি নবী ইদ্রিস আ. নামেও কথিত] ইবনে যেরদ মহললেল ইবনে কৈনন ইবনে ইনোশ ইবনে শিস [শেথ] ইবনে (নবী) আদম (আ.)।'

এই বংশধারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আশিসযুক্ত ও অত্যন্ত অত্যাশ্চর্য। এতে কমপক্ষে ছয় জন নবী রয়েছেন (হযরত মুহাম্মদ, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইব্রাহীম, হযরত নূহ, হযরত ইদ্রিস এবং হযরত আদম আলাইহিমুস সালাম)।

ইসলাম গ্রহণের পূর্ববর্তী জীবন

হযরত আবু বকরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের আগের জীবন সম্পর্কে তেমন একটা জানা যায় না। গবেষকরা মোটামুটিভাবে মনে করেন, রসূল (সা.)-এর জন্মের প্রায় আড়াই বছর পর, অর্থাৎ, ৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের বড় একটি অংশ তিনি ব্যয় করেন মক্কায়, সফল ব্যবসায়ী হওয়ার কলা-কৌশল শিক্ষায়। তিনি প্রায়ই মক্কা থেকে বিভিন্ন দেশে কারাভাঁ (কাফেলা) নিয়ে ব্যবসায়িক সফরে যেতেন। ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি অত্যন্ত সফল হন এবং খুব দ্রুতই তিনি ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এটা জানা যায় যে, তার জীবনের প্রথম অংশে হযরত আবু বকর (রা.) বেদুইনের জীবন-যাপন করেছেন। লোকে তাকে জানতো, উট সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ব্যক্তি হিসেবে। তিনি বহু উটের মালিকও হয়েছিলেন। ন্যায়পরায়ণতা এবং ন্যায়সঙ্গত আচরণের জন্য তার খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বস্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে তার সুখ্যাতির জন্য বহু গোত্রের লোকেরা তার কাছে রক্ত-পণ থেকে শুরু করে অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীও আমানত রাখতো।

ইসলামের সত্যতার এটাও একটা স্বাভাবিক নিদর্শন যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর পরই লোকেরা অন্ধকার থেকে আধ্যাত্মিক আলোয় আলোকিত হয়েছে। যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। কারণ, প্রাক-ইসলামী যুগের অন্যান্য আরববাসীর মতো তিনি ছিলেন না। তিনি জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার) যুগেও সৎ এবং পবিত্র জীবন কাটিয়েছেন। তিনি কেন এতো সৎ ছিলেন তা বোঝা খুবই সহজ, আসলে যৌবনে তিনি খুবই ভালো একজন লোকের সাহচর্য পেয়েছিলেন। হ্যাঁ, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বন্ধু ছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের আগে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সঙ্গে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বন্ধুত্ব সম্বন্ধে জমখশরি লিখেন:[১১]

'মহানবী (সা.)-এর নামের সঙ্গে আবু বকরের নাম চিরকাল পাশাপাশি থাকবে। যৌবনেও সে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল, আর যখন সে পরিণত বয়সে পৌঁছুলো, তখন নিজের ধন-সম্পদ তার (সা.) খেদমতে পেশ করে দিল ...'

তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরও একটি দিক হলো, রসূল (সা.)-এর স্বল্প-সংখ্যক সাহাবীর মধ্যে তিনিও সেই একজন, যারা প্রাক-ইসলামিক যুগে মদ্যপান থেকে বিরত ছিলেন। সাহাবীদের এক মজলিসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি কখনও মদ্যপান করেছেন কিনা। জবাবে তিনি প্রশ্নকারীকে তিরস্কার করে বলেন:[১২]

'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই ... আমি আমার সম্মান এবং পৌরুষ বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। কারণ, যারা মদ্যপান করে তারা সম্মান এবং পৌরুষ — দুটোই হারাবে।'

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এই ঘটনা বলা হলে তিনি (সা.) মন্তব্য করেন:

'আবু বকর সত্য কথাই বলেছে, আবু বকর সত্য কথাই বলেছে।'

তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কতিপয় পণ্ডিত মনে করেন, আবু বকর (রা.) ছিল স্বাধীন ও বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম। এভাবে শিশুদের মধ্যে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে হযরত আলী (রা.) এবং নারীদের মধ্যে প্রথম হযরত খাদিজা (রা.)। হযরত আবু বকর যে বয়স্ক স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী তা ইমাম আল-সুয়ূতিও সমর্থন করেন। এর সাক্ষ্য হিসেবে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়কার মহান কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)-এর কবিতার উদাহরণ টানেন। হযরত আশ-শাবি (রা.) বর্ণনা করেন:[১৩]

‘যখন তুমি কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর বেদনার কথা স্মরণ করো, তখন তুমি তোমার ভাই আবু বকরের অবদানের কথা স্মরণ করো।

নবী ছাড়া সৃষ্টির মধ্যে সেরা, তাদের মধ্যে সবচে’ পরহেযগার, সংযমী ও বাধ্য, সবচে’ ন্যায়পরায়ণ ও নিজ কাজে সবচে’ আন্তরিক।

উম্মতের মধ্যে দ্বিতীয় এবং রসূলুল্লাহ্‌কে সত্যায়নের ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যে প্রথম।’

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন প্রথম বয়‘আত গ্রহণ শুরু করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) মক্কায় ছিলেন না।

পূর্ণ বয়স্ক মানুষদের মধ্যে প্রথম বয়‘আত করেন রসুল করীম (সা.)-এর গোলাম/দাস, যাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)। তখন তার বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মনে করেন[১৪], মক্কায় ফিরেই হযরত আবু বকর (রা.) শুনতে পান যে, তার বন্ধু [অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)] পাগল হয়ে গেছেন, তিনি [সা.] লোকদের বলছেন, তার [সা.] কাছে ফেরেশ্‌তা নাজিল হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বাণী দান করেছে। হযরত আবু বকর (রা.) ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই তিনি জানতেন যে, যদি তার বন্ধু সত্যি সত্যিই এ রকম দাবি করে থাকে, তবে তা অবশ্যই সত্য। এ রকম অসাধারণ বিশ্বাসই তিনি রেখেছিলেন হযরত রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘরে গেলেন এবং ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রসূল (সা.)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। পাছে কোনো ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, তাই রসূল করীম (সা.) একটু বিস্তৃতভাবে তার দাবির কথা বলতে গেলেন। কিন্তু, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, আমি কোনো ব্যাখ্যা শুনতে চাই না। আপনি কেবল এতোটুকু বলুন যে, আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা আপনার উপর ওহী নাজিল করেছে কিনা?

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবারও বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তখন আবারও আবু বকর (রা.) বললেন, তার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শোনার দরকার নেই। শুধু এতোটুকু জানার দরকার যে, আল্লাহ্ কি তার সঙ্গে কথা বলেছেন কিনা। তখন রসূল করীম (সা.) হ্যাঁ বললেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) কোনো ধরনের ইতস্তত ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে রসূল (সা.)-এর দাবি মেনে নিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, রসূল (সা.) বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা

এবং গ্রহণযোগ্যতা থেকে তার মনোযোগ ভিন্ন দিকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। এই ঘটনাটি পড়ার পর হযরত আবু বকরের (রা.) মতো 'বিশ্বস্ত একজনের' নিষ্ঠা ও তাক্ওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্য থেকে কে প্রশ্ন তুলতে পারে? উচ্চ পর্যায়ের তাক্ওয়াশীল ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আবু বকরের (রা.) উচ্চ মর্যাদা ও অবস্থানের বিষয়টি বোঝার জন্য শুধু এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে সবচে' জমকালো ও দৃষ্টি আকর্ষক ঘটনা। কারণ, এর ভিত্তি ছিল পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং এজন্য অন্য কোনো কিছুর দরকার হয় নি। নিঃসন্দেহে, বিশ্বাস স্থাপনের এই অনুপম ঘটনা হযরত আবু বকরকে (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে যাদের কথা নিচের আয়াতটিতে বলা হয়েছে:[১৫]

'আর ধর্মের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম আর কে, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? নিশ্চয় আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।'

(সূরা আন্ নিসা, ৪:১২৬ আয়াত)

এই আয়াতে বিশেষ একটি শব্দ 'বিশেষ বন্ধু' (খলীল) উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আরবী শব্দ 'খুল্লাহ্' থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ 'খুব গভীর বন্ধুত্ব'। এটি দিয়ে অত্যন্ত যথার্থভাবে বিশেষ বন্ধুত্ব বা ভালোবাসা বোঝানো হয়েছে, যা হৃদয়কে বিদ্ধ করে।[১৬] এই ধাতুমূল থেকে উদ্ভুত শব্দ 'খলীল' দিয়ে বিশেষ বন্ধুকে বোঝায়, যে হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগকে স্পর্শ করে/বিদ্ধ করে।[১৭]

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে[১৮] তার (সা.) প্রতি আবু বকরের স্থির ও অবিচল বিশ্বাস, আস্থা এবং আনুগত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের উভয়কে এভাবে সংযুক্ত করেছেন যে, তারা 'খলীল'।

এ ঘটনাটি পুনর্ব্যক্ত করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে আরও একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন:[১৯]

'আমি যদি কাউকে খলীল (বিশেষ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু, আমার খলীল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা।'

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী

যেদিন তিনি বয়'আত গ্রহণ করলেন সেদিন থেকে তিনি মহানবী (সা.)-এর পরিষ্কার অনুমতি ছাড়া তার (সা.) সাহচর্য ত্যাগ করতেন না। শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অনুমতি সাপেক্ষে রসূল (সা.)-এর সংস্পর্শ থেকে দূরে চলে যেতেন। যেমন, হজ্ব বা কোনো যুদ্ধাভিযান। বলা হয়ে থাকে যে,[২০] মজলিসে বা সমাবেশে সাহাবীরা হযরত রসূল করীম (সা.)-কে এমনভাবে ঘিরে রাখতেন আর এতোটা মনোযোগ দিয়ে তার (সা.) কথা শুনতেন যে, মনে হতো রসূল (সা.)-কে নিরেট একটি দেয়াল ঘিরে রেখেছে। এক্ষেত্রেও রসূল (সা.) সর্বদা তার পাশে তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত শিষ্য হযরত আবু বকরের (রা.) জন্য বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন। যখনই হযরত আবু বকর এখানে এসে যোগ দিতেন, তখন রসূল (সা.) সবার উদ্দেশে কথা বললেও সেসব বলতেন হযরত আবু বকরের (রা.) চেহারার দিকে তাকিয়ে।

যেভাবে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, মক্কা থেকে মদীনায় হযরত রসূল করীম (সা.)-এর হিজরতের সময় হযরত আবু বকর (রা.) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এছাড়া, পথিমধ্যে মক্কার মোশরেকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রসূল (সা.) যখন সওর গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন তখনও তার সঙ্গে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বান্দা হযরত রসূল করীম (সা.)-এর এই ভয়াবহ বিপদের দিনে তার (সা.) সঙ্গী হিসেবে হযরত আবু বকরকেই (রা.) নির্দিষ্ট করেছিলেন, অন্য কাউকে নয়। সওর গুহায় অবস্থানকালীন সেই অত্যাশ্চর্য, নিদর্শনময় তিনটি দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হযরত রসূল করীম (সা.) তার সাহাবীদের মধ্যে যারা কাব্য চর্চা করতো সেই সব কবির অন্যতম হযরত হাস্‌সান বিন সাবিতকে বলেন তার চোখ-ধাঁধানো কলমে আবু বকরকে (রা.) নিয়ে কবিতা লিখতে। তখন হাস্‌সান বিন সাবিত এতে সম্মত হন ও আবৃত্তি করেন:[২১]

"মর্যাদাময় গুহায় দু'জনের মধ্যে যে দ্বিতীয়,
তার পর্বতারোহণের পর
চারিধারে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে শত্রুর দল,
রসূলের তরে ভালোবাসা তার
জানে যে সকলেই।
[এক্ষেত্রে] সৃষ্টির মাঝে তার সম যে কেউ নেই।"

নিঃসন্দেহে, আবু বকরের (রা.) প্রতি হযরত রসূল (সা.)-এর গভীর ভালোবাসা ছিল। আর এটা সৃষ্টি হয়েছিল মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি হযরত আবু বকরের ক্রমাগত ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কুরবানির কারণে।

হযরত আবু বকরের (রা.) জীবনে এভাবে বর্ণনা করা যায়, সব ভালো ও পুণ্যময় কাজে উৎকর্ষ সাধনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী এবং খুবই দয়ালু ও উদার ছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আরববাসী বুঝতে পারলো যে, সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হলো সবচে' উদার। এটা তার স্বভাবের অংশ হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে তিনি সব সময় দাসদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিতেন। হযরত বিলাল আল-হাবশী (রা.) এর মুক্তির ঘটনাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তিনি দাস ছিলেন এবং অত্যন্ত ভয়াবহ নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার মহান সৌভাগ্য জুটেছিল হযরত আবু বকরেরই (রা.)। এ রকম আরেকটি ঘটনা হলো হযরত জিন্নেরাহ (রা.) এর মুক্তির ঘটনা। হযরত আবু বকর (রা.) তাকেও দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। সেই যুগে দাস-মুক্তির ক্ষেত্রে টাকা দিতে হতো। মুক্তিলাভের কয়েক দিন পরই হযরত জিন্নেরাহ (রা.) অন্ধ হয়ে যান। এই ঘটনায় কুরাইশরা খুব গর্ব করে এবং তাকে ও হযরত আবু বকরকে (রা.) টিটকারি মারতে থাকে। তার বলে যে, তিনি অন্ধ হয়েছেন 'সত্যিকারের খোদা'র [অর্থাৎ দেব-দেবীর] অভিশাপে। আল-লাত এবং আল-উজ্জাই [এ দু'টি মুশরেকদের দুটি দেব-দেবীর নাম] তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। হযরত জিন্নেরাহ (রা.) জবাবে তাদেরকে তিরস্কার করেন এবং নিজ ঈমানের ওপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এরপর, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে তিনি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।[২২]

হযরত আবু বকর (রা.) যেসব দাসকে মুক্ত করেছিলেন তাদের হৃদয় ঈমানের শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এমনি এক নারী, যাকে হযরত আবু বকর (রা.) মুক্ত করেছিলেন, পরবর্তীকালে মুশরেকদের হাতে বন্দি হয়ে যান এবং অনেক প্রহারের শিকারে পরিণত হন।

অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে দাসমুক্ত করার ক্ষেত্রেই শুধু তিনি নিয়োজিত ছিলেন না; বরং, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে হযরত আবু বকর (রা.) তার ধন-সম্পদ এমনকি জীবন পর্যন্ত কুরবানি করতে এক সেকেন্ডও দ্বিধা করতেন না। সৎকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) এর মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা ছিল। একবার একটি বিশেষ প্রয়োজনে

মহানবী (সা.) ধন-সম্পদ কুরবানির আহ্বান করেন। সেসময়ে যখন হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কী নিয়ে এসেছো? জবাবে তিনি জানালেন তার সমস্ত ধন-সম্পদের অর্ধেক তিনি নিয়ে এসেছেন। আর যখন এই একই প্রশ্ন হযরত আবু বকরকে (রা.) করা হলো, তখন জবাব এলো, তিনি আল্লাহ্ ও তার রসূল (সা.)-এর নাম ছাড়া বাদ-বাকি সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছেন। এক্ষেত্রে মানবজাতির জন্য হযরত আবু বকর (রা.) এক অনুপম দৃষ্টান্ত। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন:[২৩]

'আবু বকর ছাড়া আর কারও কাছে আমি ঋণী নই। সে আমাকে এমন বাধ্যবাধকতায় ফেলে দিয়েছে যে, হাশরের দিন এই ঋণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাকে পরিশোধ করবেন। আবু বকরের অর্থ-সম্পদের মতো আর কারও অর্থ-সম্পদই আমার এতো কাজে আসে নি।'

তার মেয়ে হযরত আয়েশার (রা.) জন্যও হযরত আবু বকর সৌভাগ্যমণ্ডিত ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন হযরত রসূল করীম (সা.)-এর স্ত্রী। অত্যন্ত সৌভাগ্যমণ্ডিত এই বিয়ে এবং এর পরিপূর্ণতা (consummation) সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন হযরত মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) তার *'Muhammad; Seal of the Prophets'* [২৪] বইয়ে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:

হিজরতের দুই বছর আগে হযরত রসূল করীম (সা.)-কে হযরত খাওলাহ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন: 'ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা.), আপনি কেন (আবার) বিয়ে করছেন না?' জবাবে রসূল (সা.) বলেন, কাকে বিয়ে করবো আমি? তখন বিবি খাওলাহ জানতে চান যে, রসূল (সা.) কি কুমারী বিয়েতে আগ্রহী নাকি বিধবা নারী? কুমারী মেয়েকে বিয়েতে আগ্রহী হলে হযরত আয়েশা আছে আর বিধবার ক্ষেত্রে রয়েছে হযরত সাওদাহ (রা.)। তখন হযরত রসূল (সা.) এই দু'জনের ব্যাপারেই আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এই বিষয়ে অগ্রসর হতে হযরত খাওলাহকে অনুরোধ করেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) খুবই খুশী হোন। তবে তিনি প্রথমেই বিষয়টি নিয়ে হযরত রসূল করীম (সা.) এর সঙ্গে কাছে জানতে চান যে, যেহেতু তাদের দু'জনের [অর্থাৎ, হযরত আবু বকর ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)] মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান, এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাকে বুঝালেন যে, দৈহিক সম্পর্কের ধারায় আপন ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে বৈধ নয়। আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই এক্ষেত্রে। এর পর, নবুওয়তের দশম বর্ষের

শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা ও হযরত সাওদাহ-এর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে হয়। এ দু'টি বিয়েতেই দেন-মোহর ছিল মাত্র ৪০০ দিরহাম করে।

হযরত আবু বকরের (রা.) প্রতি রসূল করীম (সা.)-এর ভালোবাসার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) বরাতে একটি হাদীসের উল্লেখ করা যায়:[২৫]

'আবু বকরের চেয়ে বেশি আর কেউ আমার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে নি। সে নিজেকে এবং তার ধন-সম্পদকে আমার অংশীদার করেছে এবং তার মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিয়েছে।'

হযরত আবু বকরের (রা.) জীবনী বর্ণনা থেকে ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে বিয়ের সময় হযরত আয়েশার বয়স কতো ছিল তা বলাটা জরুরি। কারণ, ইসলামের বিরুদ্ধবাদিরা এই বিষয়টিতে জল ঘোলা করার চেষ্টা করে থাকে এবং প্রবল সমালোচনা করে থাকে। কিছু 'অজ্ঞ' মুসলমানের 'গবেষণা'কে কাজে লাগিয়ে ইসলাম-বিরোধিরা বলে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) এবং হযরত আয়েশার বিয়ে নাকি হয়েছিল তখন, যখন আয়েশার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ কি ছয় বছর। এরপর তারা বলে যে, এই বিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে [অর্থাৎ, রসূল (সা.) আয়েশার সঙ্গে ঘর-সংসার ও অন্যান্য সম্পর্ক শুরু করেন] আয়েশা যখন নয় কিংবা দশ বছর বয়সে উপনীত হন তখন থেকে। এসব আপত্তির ভিত্তি হচ্ছে চরমভাবে সঠিক তথ্যের বিকৃতিসাধন আর অর্ধ-সত্যের উদ্দেশ্যমূলক সংমিশ্রণ। ঐতিহাসিক গবেষণায় দেখা যায়, বস্তুত, হিজরতের দুই বছর আগে নিকাহ্ (বিয়ের ঘোষণা) এর সময়ে হযরত আয়েশার বয়স ছিল দশ বছর। হিজরতের তিন বছর পর তাকে হযরত রসূল করীম (সা.) ঘরে তুলে নেন। তখন বিবি আয়েশার বয়স পনের বছর হয়ে গেছে। সেই যুগে পনের বছর বয়সে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করাটা অস্বাভাবিক বা চোখে লাগার মতো বিশেষ কোনো ঘটনা ছিল না। আরব উপদ্বীপের উষ্ণ আবহাওয়ায় মেয়েরা পনের বছরের আগেই বয়োঃসন্ধি ও যৌবন লাভ করে এবং সেই বয়সেই তারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে থাকে। এই বিয়ের পেছনে যে ঐশী হিকমত বা প্রজ্ঞা ছিল তা বর্ণনা করেছেন হযরত মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান:[২৬]

'তাঁর [রসূল (সা.)-এর] একটি বিয়েও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা পূরণের নিমিত্তে ছিল না। আয়েশার সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হয়, তখন আয়েশার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। সে ছিল তাঁর (সা.) সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও অনুরক্ত বন্ধুর মেয়ে। সে অত্যন্ত পবিত্র পরিবেশের মধ্যে লালিত-

পালিত হয়েছে। রসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তার মনমানসিকতা এমন ছাঁচে গড়ে উঠবে যে, তা পরবর্তীকালে খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। একজন নারীর যে-সব ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন তার সবই সে সরাসরি রসূল করীম (সা.)-এর কাছে লাভ করতো। ফলে তার মাধ্যমে নারী জাতি এসব শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাবে। তিনি মেয়েদেরকে উপদেশ দানের পাশাপাশি নিজের আমলের মাধ্যমে উদাহরণও পেশ করবেন। এজন্য তার যেমন দীর্ঘায়ু পাওয়ার দরকার ছিল, তেমনি দরকার ছিল তিনি যেন দীর্ঘ সময় ধরে হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সা.) সাহচর্য লাভ করেন। ফলে তার দ্বারা পুরো মুসলিম সমাজ অনেক সেবা পাবে, অনেক বিধি-নিষেধ জানতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঘটেছিল। হযরত আয়েশার মাধ্যমেই পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষার ও হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সুন্নাহ ও হাদীসের অনেক বড় অংশ লাভ করেছে।'

[Muhammad Zafrullah Khan. *Muhammad; Seal of the Prophets (saw).* p. 61]

এতে বোঝা যায়, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সঙ্গে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বন্ধুত্ব আরও গভীরতা লাভ করেছিল আবু বকরের মেয়ে বিবি আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বিয়ের মাধ্যমে। বিবি আয়েশার প্রতি রসূল করীম (সা.)-এর বিশেষ ভালোবাসা ছিল, যার তুলনা মেলা ভার। হযরত আয়েশা সম্পর্কে রসূল করীম (সা.) বলেছেন:[২৭]

"পুরুষদের মধ্যে বহু লোক নিষ্কলুষতা/পরিপূর্ণতা (perfection) অর্জন করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের মেয়ে মরিয়ম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ এটা অর্জন করে নি। আর অন্য নারীদের মধ্যে আয়েশার উচ্চ অবস্থান এমনই, যেমন কিনা অন্য সব খাবারের উপর সারিদ-এর স্থান। (আরবে প্রচলিত রান্না করা এক ধরনের খাবার হলো সারিদ)।"

হযরত আবু বকর (রা.) সারা জীবন ধরেই ক্ষমাশীল ব্যক্তি ছিলেন। বলা যায়, মানুষের দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করার জন্য তিনি মওকা খুঁজতেন, তাই তাদের মধ্যে তিনি ভালো কোনো গুণ তালাশ করতেন। যারা তার প্রতি অন্যায় আচরণ করতো তাদের সঙ্গেও তিনি ন্যায়পরায়ণ আচরণ করতেন, প্রতিশোধমূলক কোনো খারাপ আচরণ করতেন না। এ রকম একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়: একবার তার মেয়ে, উম্মুল মুমেনিন বিবি আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা হয়। যে ব্যক্তি হযরত আয়েশার নামে নানা রকম

আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছিল সে আবার হযরত আবু বকরের আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। সে লোকের পরিবার চলতো হযরত আবু বকরের দানের টাকায়। তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আবু বকর সেই লোককে আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিলেও অন্তরের উদারতা ও মহত্ত্ব তার (রা.) রাগের ওপর ছেয়ে যায়। তিনি আবার নতুন করে সেই 'অপরাধী'কে আর্থিক সাহায্য প্রদান শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, মহানবী (সা.) এ ঘটনা জানতে পেরে হযরত আবু বকরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ক্ষমাই সর্বোত্তম প্রতিশোধ। এভাবে সারা জীবন ধরেই হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মতো এক সুমহান শিক্ষকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ও সাহচর্যে ছিলেন। এ দিক থেকেও তিনি অবশ্যই মহাসৌভাগ্যবান, সন্দেহ নেই।[২৮]

জীবনের শেষ ভাগে খলীফা হিসেবে তার অর্জনগুলোর বর্ণনা দেওয়ার আগে এর পূর্ববর্তী জীবনে দা'ঈ ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী) হিসেবে হযরত আবু বকরের (রা.) মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা দরকার। তিনি এক অসাধারণ ধর্মপ্রচারক ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুমতিক্রমে সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জনসমক্ষে ইসলামের তবলীগ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকরের জন্য এটা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি সবসময়ই রসূল করীম (সা.)-এর কাছে খোলাখুলি তবলীগের অনুমতি চাইতেন। কিন্তু, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সব সময় তাকে এক্ষেত্রে নিরুৎসাহিতই করে এসেছেন। কারণ, তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী এটা সঠিক কাজ হতো না। একদিন আবু বকরকে অনুমতি দেওয়া হলো। তখন তিনি (রা.) কাবা গৃহের বাইরে বিশাল এক জমায়েতের মাঝে দাঁড়ালেন এবং নিজের নিরাপত্তার দিকে কোনো খেয়াল না রেখেই উপস্থিত বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' (সরল-সুদৃঢ় পথ)-এ আসার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। উপস্থিত লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে আবু বকরসহ উপস্থিত সব মুসলমানকে পেটাতে লাগলো। এদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, অল্পের জন্য সেবার হযরত আবু বকরের জীবন রক্ষা পায়। তার নিজের গোত্রের লোকেরা তাকে উদ্ধার করে। প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য গোত্রের হাতে আবু বকর মার খেলে তার গোত্রের সম্মান নষ্ট হবে, তাই গোত্রীয় সম্মান রক্ষার খাতিরেই তারা আবু বকর (রা.)-কে উদ্ধার করেছিল। তিনি এমন আহতই হয়েছিলেন যে, তার চেহারা থেকে নাকি তার নাক আলাদা করা যাচ্ছিল না! এতো মার খাওয়ার পর, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ থেকে ফিরে আসার পর, যখন কিনা তিনি

কোনো মামুলি কাজও করতে পারছিলেন না, তখনও তিনি (রা.) বিশ্রাম নিতে রাজি হন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন যে, তার কিছু হয় নি, শরীর ভালো আছে। অত্যন্ত আবেগবহ এই ঘটনা দেখে আবু বকরের মা হযরত উম্মুল খায়ের (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা কিন্তু হযরত আবু বকরের (রা.) মতো মহান দা'ঈ ইলাল্লাহ্কে তবলীগি কাজে নিরুৎসাহিত করে নি। লোকজনকে ইসলামের সুমহান আহ্বান জানাতে তিনি আরও দৃঢ়সঙ্কল্প হন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তার পরিবারের সৌভাগ্যশালী সদস্য/সদস্যা ছাড়াও হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.), হযরত আল-যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-সহ অগণিত ব্যক্তিকে তিনি ইসলামে দাখিল করেন।[২৯]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু

খলীফা হওয়ার আগে হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কঠিন একটি সময় পার করেছেন রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে। এটা তার জীবনের বিশেষ একটি পরীক্ষার সময় ছিল। কারণ, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার অসাধারণ ভালোবাসা এবং সেই সময়টিতে তার প্রতি অর্পিত কিছু গুরু দায়িত্ব। অসুস্থ্যতার জন্য যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাজে ইমামতি করতে পারছিলেন না, তখন তিনি ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন হযরত আবু বকরের উপর। অনেকেই, বিশেষত, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মীনিরাও এটা অনুভব করছিলেন যে, আবু বকরের মতো নরম হৃদয়ের মানুষের ওপর এই দায়িত্ব খুব বড় বোঝা হয়ে যাবে। কিন্তু, এই সিদ্ধান্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.) খুব দৃঢ় ও অবিচল ছিলেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা আল তাবারি বলেন, প্রায় তিন দিন বা ১৭ ওয়াক্তের নামাজে তিনি মহানবী (সা.)-এর ডেপুটি হিসেবে, অত্যন্ত মনোঃকষ্টের সঙ্গে নামাজে ইমামতি করেছেন।[৩০]

একটি হৃদয়স্পর্শী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর যখন নামাজে ইমামতি করছিল তখন দু'জন সাহাবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মসজিদে নিয়ে আসে। রসূল (সা.) এমনই অসুস্থ্য ছিলেন যে, দু'জন সাহাবীর সঙ্গে তিনি যখন মসজিদে যাচ্ছিলেন তখন তার পা মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছিল। মসজিদে রসূলুল্লাহ্র উপস্থিতি টের পেয়ে আবু বকর কাঁদতে লাগলেন কিন্তু নামাজে ইমামতির দায়িত্বও পুরোপুরি পালন করলেন; কারণ, এই দায়িত্ব রসূল করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াস্‌সালামই তাকে দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি তার ভালোবাসা ও আনুগত্য এতোই গভীর ও প্রগাঢ় ছিল যে, তখন তিনি ইমামতি ছেড়ে পেছনে চলে আসতে উদ্যত হয়েছিলেন, যেন হযরত রসূল করীম (সা.) নামাজে ইমামতি করতে পারেন। কিন্তু, হযরত রসূল করীম (সা.) এটা অনুমোদন করেন নি। তার ইমামতিতে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) নামাজ আদায় করবেন — এটা আবু বকর (রা.) কোনোভাবেই মানতে পারছিলেন না, তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এথেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করেন। নামাজে ইমামতির সময় আবু বকর এমনভাবে দাঁড়াতেন যেন মুসুল্লিরা ভাবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই ইমামতি করছেন। ব্যাপারটি ছিল এ রকম যে, মুসুল্লিরা নামাজে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অনুকরণ করতো আর রসূল করীম (সা.) অনুসরণ করতেন নামাযের ইমাম হযরত আবু বকরকে।

মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোর বিভিন্ন ঘটনায় তার (সা.) সঙ্গে হযরত আবু বকরের গভীর সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, আবু বকর রসূল (সা.)-কে এবং আল-কুরআন খুব ভালো বুঝতেন। একদিন মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশে বলেন:[৩১]

"আমি আজকে এই ওহী লাভ করেছি:

'ইজা যা আনাসরুল্লাহে ওয়াল ফাতহু। ওয়ারা আইতান্নাছা ইয়াদখুলুনা ফী দিনিল্লাহে আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ বেহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফেরহু। ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা।'"

[অর্থ: যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় আসবে এবং তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি বার বার সদয়দৃষ্টি নিবদ্ধকারী। সূরা নাসর, ১১০:২-৪ আয়াত)]

কুর'আনের কোনো নতুন অংশ ওহী হলে আবু বকর (রা.) সাধারণত খুব খুশি হতেন এবং আগ্রহভরে তা শুনতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশের পরিবর্তে হাউমাউ করে কান্নাকাটি শুরু করেন। অবতীর্ণ এই আয়াতগুলোয় ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি কাঁদছেন! এটা দেখে উপস্থিত অন্য সাহাবারা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। হযরত উমর এতে উত্তেজিত হলেন। তিনি ও আরও কয়েকজন সাহাবা (রা.) তখন আবু

বকরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। তারা বুঝতে পারেন নি যে, এই আয়াতগুলোতে ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বিদায়ের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। সব সাহাবীর মধ্যে এই ইঙ্গিতটি কেবল হযরত আবু বকরই তাৎক্ষণিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যই তিনি কান্না থামাতে পারেন নি।

আর এক ব্যক্তি তার বন্ধুর প্রতি কতোটুকু ভালোবাসা পোষণ করতে পারে — সেটা বোঝা যায় হযরত রসূর করীম (সা.)-এর কথায়:[৩২]

"আবু বকর আমার খুবই ঘনিষ্ঠ। যদি কাউকে সীমাহীন ভালোবাসা বৈধ হতো, তাহলে আমি আবু বকরকে ভালোবাসতাম। কিন্তু, এই পর্যায়ের ভালোবাসা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট। হে লোকেরা, আজ থেকে এই মসজিদের উদ্দেশে সকলের দরোজা বন্ধ, কেবল আবু বকরের দরোজা খোলা।"

মহানবী (সা.)-এর কোন একনিষ্ঠ প্রেমিক তার কাছ থেকে এর চেয়ে মূল্যবান কথা নিজের সম্পর্কে শোনার আকাঙ্ক্ষা করবে না? সেদিন মসজিদে এমন কোনো লোক বাকি ছিল না যে, আবু বকরের প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র এই ভালোবাসার প্রকাশকে মূল্যায়ন করে নি।

খেলাফত লাভ

খাতামুন্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পর মুসলমানদের মধ্যে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। অত্যন্ত শোকাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখন। লোকজন দুঃখে ও ভয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। রসূল করীম (সা.) এর মৃত্যুর পর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে ইবনে রজব লেখেন:[৩৩]

"... [মুসলমানরা] শোকাহত, হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তাদের কেউ কেউ বিমূঢ় ও বিভ্রান্তও হয়ে যায়। অন্যরা বসে পড়ে ও উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। কেউ কেউ বাক্‌হারা হয়ে পড়ে। আর এমনও কেউ কেউ ছিল যারা কোনোভাবে মানতেই পারছিল না যে, রসূল (সা.) মারা গেছেন, তারা স্রেফ এই বিষয়টি অস্বীকার করছিল।"

হযরত রসূলে করীম (সা.) যেদিন মারা যান, তখন হযরত আবু বকর (রা.) মদীনার বাইরে ছিলেন। মদীনায় ফিরে এসেই তিনি সেই ঘরে গেলেন যেখানে মহানবী (সা.)-এর আশিসমণ্ডিত মৃতদেহ রাখা হয়েছিল। অশ্রুসজল চোখে আবু বকর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কপালে চুমু খেলেন এবং উপস্থিত সমবেত জনতার সামনে গেলেন। সেখানে হযরত উমর (রা.) খোলা তরবারি

হাতে টলছিলেন আর বলছিলেন, যে বলবে যে রসূল (সা.) মারা গেছেন তার কল্লা উড়িয়ে দেওয়া হবে। আবু বকর উমরকে বসতে বললেন। তারপর উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি এই কথাগুলো বললেন:[৩৪]

"যারা মুহাম্মদের ইবাদত করতে তারা শুনে নাও, মুহাম্মদ নিঃসন্দেহে মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তারা শুনে নাও, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মারা যান না।"

এরপর তিনি তার বক্তৃতার সমর্থনে আল কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন:[৩৫]

"আর মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয় তার পূর্বের সব রসূল গত হয়ে গেছে। অতএব সেও যদি মারা যায় বা নিহত হয় তোমরা কি তবে তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় সে কখনও আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের অবশ্যই প্রতিদান দিবেন।"

(আলে ইমরান, ৩:১৪৫ আয়াত)

আল-কুরতুবি খুব তীক্ষ্ণভাবে হযরত আবু বকরের এই ভূমিকাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটাকে তিনি আবু বকরের সাহসিকতার সর্বোচ্চ প্রকাশ বলে মনে করেন। তিনি বলেন:[৩৬]

"... দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদের দিনে দৃঢ়তা প্রদর্শন করা ও অবিচল থাকাকে সাহসিকতা বলা হলে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর চেয়ে বড় বিপর্যয় তো আর কিছু হতে পারে না।"

এটাই ইসলামের প্রথম ইজমা (সর্ববাদীসম্মত মত) যে, মহানবী (সা.) নিঃসন্দেহে মারা গেছেন।

খলীফা কীভাবে নির্বাচিত হবে সে বিষয়ে তখন কোনো প্রতিষ্ঠিত নেযাম বা পদ্ধতি ছিল না। আর এই সমস্যায় নিপতিত হয়েছিল রসূল (সা.)-এর সাহাবীরা। তখন আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল যে, কে হবেন খলীফা, কে মুমিনদের জামা'তকে নেতৃত্ব দেবেন? এরকম জটিল পরিস্থিতিতে একমাত্র হযরত আবু বকরই পারতেন এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে ঠাণ্ডা করতে। কারণ, তিনি ছিলেন তাদের সবার মধ্যে সবচে' কোমল ও নম্র হৃদয়ের অধিকারী।

আনসাররা এবং মুহাজেররা একযোগে হযরত আবু বকরকে খলীফাতুর রাসূল হিসেবে মেনে নিল। এই আশিসযুক্ত দিনটি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখেন:[৩৭]

"হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) সময়ে দেখা যায়, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে বড় অসময়ের মৃত্যু ভাবা হচ্ছিল। তখন বহু অজ্ঞ বেদুইন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। সাহাবারাও অত্যন্ত শোকাহত হয়েছিল, তারা যেন তাদের চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিল। তখন আল্লাহ্ আবু বকরকে দণ্ডায়মান করলেন এবং দ্বিতীয় বারের মতো তার কুদরতের বিকাশ দেখালেন। এভাবেই ইসলাম, যা পতনোন্মুখ ছিল, তাঁর [আল্লাহ্র] সাহায্য লাভ করলো, তিনি [আল্লাহ্] তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন যা তিনি করেছিলেন:

'...এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন;'

(আন নূর, ২৪:৫৬ আয়াত)

অর্থাৎ, ভয়ের পর আমরা দৃঢ়ভাবে পুনঃস্থাপিত করবো। এরকমটি হযরত মুসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিল। বনী ইসরাঈলদের প্রতিশ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে, অর্থাৎ, মিশর থেকে কেনান যাওয়ার পথে তিনি মারা গেলেন। তখন তার [মুসার] মৃত্যুতে বনী ইসরাঈলরা গভীর শোকে নিমগ্ন হয়। তাওরাতে এটা লিখিত রয়েছে যে, মুসার এই অসময়ের মৃত্যুতে, বনী ইসরাঈলদের ছেড়ে এভাবে হঠাৎ করে চলে যাওয়াতে তারা একটানা চল্লিশ দিন রোদন করেছিল। এ রকম ঘটনা ঈসা (আ.) এর সময়েও ঘটেছিল। ক্রুশীয় ঘটনা ঘটার সময় তার সব শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং এমনকি একজন মুর্তাদও [ধর্মচ্যুত] হয়ে যায়।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই প্রথম ইজমাটিকে ইসলামের খেদমতে এক মহান সেবা বলে মনে করেন। কারণ, এর অবর্তমানে মুসলিম উম্মত কখনোই একতাভুক্ত হতে পারতো না। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নবী মারা গেছেন। এদের মধ্যে হযরত ঈসাও (আ.) শামেল। আরেক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করেন, হযরত আবু বকর (রা.) ছাড়া অন্য কারো খলীফা হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যেমন, তিনি (আ.) বলেন:[৩৮]

‘আমাকে বলা হয়েছে, সকল সাহাবীর মধ্যে সম্মান ও অবস্থানের দিকে দিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন সিদ্দিক (আবু বকর রা.)।’

পরবর্তী বছরগুলোতে এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলো জুড়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত নিয়ে বহু সমালোচনা করেছেন শিয়া আলেমরা। তারা মনে করতেন এবং এখনো মনে করেন হযরত আলী (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.)-এর যোগ্য উত্তরসূরী। এই কথার খণ্ডনে এতো কিছু বলা যায় যে, সেসব বর্তমান প্রবন্ধে আঁটানো যাবে না। একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী এ সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর *সির্‌রুল খিলাফাহ্* বইটি পড়তে পারেন। এতে তিনি (আ.) দেখিয়েছেন যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর কীভাবে আল-কুর’আনের আয়াতে ইস্তেখলাফ[৩৯] তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে। আর খলীফা হিসেবে এটি শুধু হযরত আবু বকরের (রা.) ওপরেই প্রযোজ্য হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখেন:[৪০]

‘আয়াতে ইস্তেখলাফে [সূরা নূর, ২৪:৫৬ আয়াত] মুসলমান নারী-পুরুষের সঙ্গে আল্লাহ্ তা’লা ওয়াদা করেছেন যে, যে কোনো ক্ষেত্রে, তার দয়া ও রহমতে কিছু মুমেন ব্যক্তি খলীফা হবে; এবং আল্লাহ্ তাদের হৃদয় থেকে ভীতি দূর করে নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তি দান করবেন। তাই এটি একটি অবস্থা যা পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে সিদ্দিক [হযরত আবু বকর] ছাড়া আর কারও ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না।’

আবু বকরের খেলাফত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং অন্য সাহাবীদের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করার আগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাবে.) এর মন্তব্য ও যুক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়। একটি প্রশ্নোত্তর[৪১] অধিবেশনে তিনি (রাহ.) অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বলেছেন: সাধারণ বিচার-বুদ্ধি খাটালেও বোঝা যায়, বলা হয়ে থাকে যে, হযরত আলী (রা.) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী সাহাবীদের একজন। যুদ্ধের ময়দানে তার শৌর্য-বীর্যের কথাও সবাই জানে। হযরত রসূল (সা.)-এর মৃত্যুর পরে হযরত আলী কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) বলেন, হযরত আলীর এতো বীরত্ব ও তাক্‌ওয়া থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন হযরত আবু বকরের হাতে বয়‘আত করলেন? রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি অন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করে থাকতেন আর সেটা যদি হযরত আলীর জানা থাকতো, তাহলে তিনি কখনোই আবু বকরের হাতে বয়‘আত নিতেন না। রসূল (সা.)-এর সরাসরি হুকুম অমান্য করে আবু বকরের হাতে বয়‘আত করার কথা বলে আপত্তিকারকেরা আসলে [এই কথার মাধ্যমে] হযরত আলীকে অপমান করে থাকে।

এর একটাই যৌক্তিক সমাধান, আর সেটি হলো, হযরত আবু বকর (রা.) যে খলীফা সেটা হযরত আলী জানতেন এবং সেজন্যই তিনি তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

এভাবে এটিও অচিন্তনীয় যে, হযরত আবু বকরের (রা.) মতো উঁচু পর্যায়ের মানুষ, যিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, তিনি জেনেশুনে এমন একটি পদমর্যাদা [অর্থাৎ, খেলাফত] গ্রহণ করবেন যা কিনা আল্লাহ্ তা'লার পেয়ারে হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্য কাউকে মনোনীত করে গেছেন। যে ব্যক্তিকে রসূল করীম (সা.) স্বয়ং সিদ্দিক [সত্যবাদী] উপাধি দিয়েছেন সেই ব্যক্তিই তার (সা.) মৃত্যুর পর এ রকম প্রতারণাময় কাজ করবেন — এমনটি চিন্তা করাই হঠকারিতার নামান্তর।

বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায়, হযরত আলী (রা.) স্বয়ং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন হযরত আবু বকরের (রা.) প্রতি। একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আলী (রা.) বলেছেন:[৪২]

'যার হাতে আমার প্রাণ, সেই আল্লাহ্‌র নামে বলছি, সৎকর্ম সম্পাদনে আমরা কখনোই হযরত আবু বকরকে ছাড়িয়ে যেতে পারি নি, সর্বদাই তিনি এক্ষেত্রে প্রথম স্থানে ছিলেন।'

আরেক বর্ণনায় এসেছে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) — উভয়েরই প্রশংসা করেছেন এবং উভয়ের প্রতিই ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন:[৪৩]

আল্লাহ্‌র রসূলের (সা.) পর মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর ও উমর। আবু বকর ও উমরকে ঘৃণা করে কোনো মুমিন আমাকে কখনোই ভালবাসতে পারবে না।'

হযরত রসূল করীম (সা.) এর চোখে হযরত আবু বকরের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় একটি মজার হাদীস[৪৪] থেকে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, একবার এক নারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তাকে বলা হলো, কিছুক্ষণ পর এসো। তখন সেই নারী জিজ্ঞাসা করলো, পরে এসে যদি আপনার দেখা না পাই [অর্থাৎ, আপনি যদি মারা যান] তাহলে কার সঙ্গে দেখা করবো? জবাবে রসূল (সা.) বললেন, আমাকে না পেলে আবু বকরের সঙ্গে দেখা করবে।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আরও একটি বিষয় হলো, রসূল (সা.) যখন অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন তখন তিনি নামাজে ইমামতির জন্য হযরত আবু বকরকে (রা.) দায়িত্ব দিলেন। এসব থেকে একজন নিষ্ঠাবান মুত্তাকী নিঃসঙ্কোচে বুঝতে পারেন যে, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর বৈধ খলীফা হলেন হযরত আবু বকর (রা.)।

খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং হযরত উমর (রা.)-এর অনুরোধে মসজিদের মিম্বরে এসে দাঁড়ালেন। হযরত উমর (রা.)-এর একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর মুসলিম উম্মাহ অত্যন্ত অর্থবহ এবং ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বিখ্যাত একটি বক্তৃতা শুনলো। মাত্র এক অনুচ্ছেদ কিংবা তারচেয়ে একটু বড় ছিল এই বক্তৃতাটি। এই বিনীত বক্তৃতার মাধ্যমে হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফতের বিষয়টিই শুধু উঠে আসে নি, বরং, সেই সব উজ্জ্বল তারকার কথাও উঠে এসেছে যারা তার অনুগমন করেছে। তিনি বলেন:[৪৫]

'হে লোকেরা, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই, তারপরও আমি নিঃসন্দেহে তোমাদের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। যদি আমি ভালো কিছু করি তাহলে আমাকে সাহায্য করবে; আর যদি আমি ভুল করি তবে আমাকে সংশোধন করবে। সত্য পূর্ণ করার সমার্থক হলো সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা হচ্ছে প্রতারণার শামিল। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল সে আমার চেয়ে শক্তিশালী হবে যতক্ষণ না আমি তার ন্যায্য পাওনা ফিরিয়ে দেই, ইনশা'আল্লাহ্। আর তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী সে আমার চেয়ে দুর্বল হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছ থেকে অন্যের ন্যায্য পাওনা কেড়ে নিয়ে ন্যায্য পাওনাদারকে প্রত্যার্পণ করি, ইনশা'আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কোনো দলই পরিত্যাগ করতে পারবে না। এ ছাড়া, আল্লাহ্ তাদেরকে অবমাননার শিকারে পরিণত করবেন। অন্যায় কাজ কোনো সমাজে বিস্তৃত করা যাবে না। যদি করা হয় তবে আল্লাহ্ ব্যাপক বিপর্যয়ে ফেলবেন। আমার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করো যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আনুগত্য করি। আর যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আনুগত্য না করি, তবে তোমাদের আনুগত্য লাভের কোনো অধিকার আমার নেই। এখন দাঁড়াও এবং দোয়া করো; আল্লাহ্ তোমাদের ওপর রহমত নাজিল করুন।'

এক মহান নেতা

অত্যন্ত বিনয় এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ এই কথাগুলি দ্বারা হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফত-কালের প্রারম্ভিক অবস্থা অনুধাবন করা যায়। এছাড়া তার খেলাফত-কালে তিনি কেমন ছিলেন সেটাও ফুটে ওঠে এর মাধ্যমে। নিরঙ্কুশ বিচারের ক্ষেত্রে তিনি একজন চ্যাম্পিওন/মহান ব্যক্তি ছিলেন। এর উদাহরণ হিসেবে তার খেলাফত-কালের শুরুতে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন সেগুলোর একটির কথা উল্লেখ করা যায়। সেটি ছিল হযরত উসামা ইবনে যায়েদের (রা.)

নেতৃত্বে একটি সেনাদল সিরিয়ায় প্রেরণের ঘটনা। আগ্রাসী রোমান সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যই এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। এই হুকুমের পেছনে যে বিচিত্র ঘটনা ছিল সেটি হলো, এটি যদিও মৃত্যুর পূর্বে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সর্বশেষ হুকুম ছিল, তারপরও বহু সাহাবী (রা.) এক্ষেত্রে হযরত আবু বকরের এই সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর তিরোধানের পর মুসলমানদের অবস্থা করুণ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় এতগুলো লোক মদীনা ছেড়ে বাইরে যাক — এটা সাহাবারা চান নি। তারা আরও আপত্তি করেছিল উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বের বিষয়ে; কারণ, ওসামা তখন অল্প-বয়স্ক যুবক ছিলেন। তার বয়স তখনও বিশ পেরোয় নি। তাদের এসব আপত্তির কিছুটা যৌক্তিকতা মেলে, মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) গোত্রগুলো হুমকি দিচ্ছিল অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির। যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) এক মুহূর্তের জন্যও পিছপা হন নি, তিনি হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর আদেশের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। যারা এই অভিযানের বিরোধিতা করেছিল সেইসব সাহাবীদের তিনি তিরস্কার করে বলেন:[৪৬]

“সেই সত্তা[র] (কসম), যার হাতে আবু বকরের প্রাণ, আমি যদি ভাবতাম বন্য হিংস্র জন্তু আমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করবে, তারপরও আমি উসামার সেনাদলকে প্রেরণ করতাম। কারণ, আল্লাহ্‌র রসূল উসামাকে এই হুকুম দিয়েছেন। এমনকি এই শহরগুলোতে যদি আমি সর্বশেষ ব্যক্তি হিসেবে থাকতাম, তাহলেও আমি একই কাজ করতাম।”

এর দ্বারা হযরত আবু বকর আল শাম-এ [বর্তমান যুগের সিরিয়া, লেবানন, জর্দান এবং ফিলিস্তিন] সেনাদল প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি উসামাকে হুকুম দেন, মহানবী (সা.) যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা বর্ণনা করেছেন সেগুলো অনুসরণ করতে। তিনি জোর দেন যে, কোনো মুসলমান যেন অবিচার না করে, গাছ না কাটে, অন্য দেশের পবিত্র লোকদের আহত না করে।[৪৭]

তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর এরকম আনুগত্য করেছেন যে, তিনি উসামাকে বলেছেন, তড়িঘড়ি করে যেন সে ফিরে না আসে। উসামা যেন সময় নেয় এবং হযরত রসূল (সা.)-এর হুকুম যেন যথাযথভাবে পালন করে। এর ফলাফল হলো, হযরত উসামা প্রায় চল্লিশ দিন পর ফিরে এসেছিলেন একটি স্বাস্থ্যবান সেনাদল-সহ, যারা আল-শাম-এ রোমান সাম্রাজ্যকে সাফল্যের সঙ্গে দমন করেছিল।

যাহোক, যখন তিনি মুসলিম সেনাদলের বেশিরভাগ অংশ এবং সামরিক রসদ নিয়ে দূরে অবস্থান করছিলেন, তখন অভ্যন্তরীণ খণ্ড-যুদ্ধের আধিক্য দেখা দেয়। এগুলোকে বলা হয় আল-রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধ। হযরত আবু বকর যে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছেন সে সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) বলেন,[৪৮]

'নবী করীম (সা.)-এর প্রথম খলীফা আবু বকরের (রা.) প্রধান কর্তব্য ছিল তখন সেনাবাহিনীকে সেই অভিযানে প্রেরণ করা, যার হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর জীবিতকালে। অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর খেলাফতের দ্বিতীয় দিবসেই উসামা বিন যায়েদ বিন হারিস-এর সেনানায়কত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন সিরিয়ার সীমান্তে।'

(মির্যা তাহের আহমদ, আল্লাহ্‌র নামে নরহত্যা, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২১)

এটা এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, যেখানে আল রিদ্দা-এর আক্ষরিক অর্থ স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা, সেখানে হুযূর (রহ.) এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, আল রিদ্দা যুদ্ধে জড়িত দলগুলোকে সাহাবীরা এই নামে [আল রিদ্দা/মুর্তাদ] অভিহিত করেছেন রূপকভাবে। এবং তারা [যাকাত দানে অস্বীকৃতি দানকারী গোত্রগুলো] বস্তুত, ইসলাম পরিত্যাগ করে নি। হুযূর (রহ.) বিদ্রোহের পেছনে সত্যিকারের ঘটনা পরিষ্কার করে দিয়েছেন বার্নার্ড লিউইসের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে:[৪৯]

"গোত্রগুলো কর্তৃক আবু বকরের (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটা কার্যত, ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়া লোকদের পূর্বধর্মে পৌত্তলিকতায় ফিরে যাওয়া ছিল না; বরং এটা ছিল, একপক্ষের মৃত্যুজনিত কারণে রাজনৈতিক চুক্তির এক প্রকার সরল ও স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। মদীনার আশেপাশের গোত্রগুলো সত্যিকার অর্থেই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল, এবং তাদের স্বার্থ 'উম্মাহ'-এর স্বার্থের সঙ্গে এত বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের আলাদা কোনো ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হয় নি। অন্যান্যদের বেলায়, মুহম্মদের [সা.] মৃত্যুতে মদীনার সঙ্গে বন্ধন আপ্‌সে আপ ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এবং এই গোত্রগুলো তাদের স্বাধীন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে দেয়। তারা নিজেদেরকে কোনোভাবেই আবু বকরের [রা.] নির্বাচন মানতে বাধ্য বলে মনে করতো না, কেননা, তারা এই নির্বাচনে কোনো অংশগ্রহণই করে নি। কাজেই তারা তৎক্ষণাৎ ট্যাক্স প্রদান ও চুক্তির শর্ত

পালন বন্ধ করে দিল। মদীনার প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃস্থাপন করার জন্য তাই, আবু বকরকে (রা.) নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছিল।'

[বার্নার্ড লিউইস, 'দি এ্যারাব্স হিস্টরী' (লন্ডন, ১৯৫৮), পৃষ্ঠা: ৫১-৫২। দেখুন, মির্যা তাহের আহমদ, 'আল্লাহ্‌র নামে নরহত্যা', বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা নং: ২৩]

বাস্তব ঘটনা হলো, আল রিদ্দা দলত্যাগীরা এমন কিছু নীতিবর্জিত লোকের [Corrupt faction] প্রতিনিধিত্ব করেছিল যারা হয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে অথবা কোনো ধরনের পূর্ব-উদ্দেশ্য ছাড়া [Unintentionally] মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরপর উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তাদেরকে মোটা দাগে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১. তারা, যারা মিথ্যা নবুওয়তের দাবি করেছিল এবং বিপথগামীদের ক্ষুদ্র দল তৈরি করেছিল।

২. তারা, যারা ইসলামের অনুবর্তীতা করতে চেয়েছিল, কিন্তু, তাদের জুলুমবাজ নেতাদের জন্য পারছিল না।

৩. তারা, যারা উম্মতের মধ্যে থেকে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু, যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল কিংবা যাকাতের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে চেয়েছিল।

৪. তারা, যারা আনুগত্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি এবং আবু বকরকে (রা.) গ্রহণ করা দরকার মনে করে নি।

এটি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য কথা যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা এবং নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, যা দূর করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করেছেন — এসব ঘটনা ছাড়া আল-রিদ্দা যুদ্ধের চেয়ে ভয়াবহ বিপদ ইসলামে আর দেখা যায় নি।

এর ফলে মুসলমান প্রদেশগুলোতে মারাত্মক রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, এর ফলে উম্মতের বহুধা বিভক্ত হওয়ারও আশঙ্কা ছিল। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর যখন উত্তরাধিকার নিয়ে সঙ্কটে নিপতিত হয়েছিল উম্মতে মুহাম্মদিয়া, তখন তারা আধ্যাত্মিকভাবে একতাবদ্ধ হয় হযরত আবু বকরের (রা.) বিচক্ষণ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা। সেই একইভাবে আল-রিদ্দা যুদ্ধের সময় বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করার জন্য এবং মুসলিম উম্মতের বাহ্যিক ও রাজনৈতিক সংহতি বজায় রাখার জন্যও হযরত আবু বকরের (রা.) উচ্চাঙ্গিন তাক্‌ওয়াপূর্ণ আচরণের দরকার হয়েছিল। মুসলমানদের উপর খারজাহ্ ইবনে হিশামের নেতৃত্বে পরিচালিত

একটি আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছেন হযরত আবু বকর (রা.)। এর পরবর্তী এক সময়ে পাঁচটি প্রখ্যাত গোত্রের প্রতিনিধি মদীনা শহরে এসেছিল যাকাতের হার কমানোর জন্য আলোচনা করতে। যাহোক, বহু সাহাবীকে (রা.) হতাশ করে দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানান। হযরত উমরের (রা.) নেতৃত্বে একটি দল আবু বকরের (রা.) সঙ্গে দেখা করেন এবং যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকরের (রা.) যুদ্ধ করার ঘোষণা সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভাষায় হতাশা ব্যক্ত করেন:[৫০]

"এই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কী অধিকার আছে আপনার? রসূলুল্লাহ্ (সা.) তো বলেছেন, 'আমি লোকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য আদ্দিষ্ট যতক্ষণ না তারা বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)। যদি তারা তা বলে, তাহলে তাদের জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ থাকবে'।"

[দেখুন, মির্যা তাহের আহমদ, 'আল্লাহ্‌র নামে নরহত্যা', বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা নং: ২২। আরও দেখুন, মুহাম্মদ ইদ্রিস আল শাফীঈ, কিতাব আল উম্ম, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ জাহরী আল নাজ্জার (কায়রো তা.বি.), খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৫৬]

এক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দণ্ডায়মান হন এবং সাহাবীদের কথা অনুসারে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। মুর্তাদ গোত্রগুলোর কার্যক্রমের পেছনের চাতুর্যপূর্ণ হঠকারিতার কথা তিনি জানতেন। নিম্নোক্ত ভাষণের মাধ্যমে তিনি মদীনাবাসীকে এই পয়গাম জানান যে:[৫১]

"প্রতিনিধি দলটি দেখে গেছে যে, তোমাদের কত স্বল্প-সংখ্যক লোক এখন মদীনায় আছে। তোমরা জান না যে, তারা তোমাদের উপরে দিনে না রাতে হামলা করে বসবে। তাদের অগ্রবর্তী দলটি এখন মদীনার অতি নিকটেই অবস্থান করছে। তারা চেয়েছিল যে, আমরা তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করি। কিন্তু আমরা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। সুতরাং, তাদের হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।"

(প্রাগুক্ত)

তার এই কথার সত্যতা প্রতিপাদন করে এর তিন দিনের মধ্যেই গোত্রগুলো মদীনার উপরে আক্রমণ চালায়। স্বল্প-সংখ্যক মুসলিম সেনা তাদেরকে প্রতিহত করে। এক্ষেত্রে এক মহান রাষ্ট্রনায়কসূলভ এবং সমর-নেতাসূলভ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় আবু বকরের (রা.) কার্যক্রমে। তিনি শুধু ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই অনুধাবন করছিলেন না, বরং তিনি ন্যূনতম সামরিক রসদ ব্যবহার করে এসব ভয়াবহ আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে সিরিয়ায় সমর অভিযানের খরচ যোগাতে গিয়েই মুসলমানদের বেশিরভাগ আর্থিক ও দৈহিক কুরবানির সামর্থ্য ফুরিয়ে গেছে, এছাড়া, লোক-স্বল্পতাও সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধরনের পরীক্ষার মধ্যেও হযরত আবু বকর সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন তার তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র উপর অবিচল বিশ্বাসের দ্বারা।

এই সময়কালে হযরত আবু বকরের (রা.) জন্য আরও একটি ভীষণ পরীক্ষা ছিল, সেটি হলো মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারকেরা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হলো মুসায়লামা কায্যাব। এর সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায়। তখন মুসায়লামা এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা ছিল। (কারণ, এতো বড় সেনাদল ইতোপূর্বে সেখানে আর দেখা যায় নি)। এর প্রতিক্রিয়ায় হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসায়লামার সেনাবাহিনীর তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য সেনাদল প্রেরণ করেন, যাতে মাত্র তের হাজার সৈন্য ছিল। পরবর্তীকালে এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয় ইয়ামামার যুদ্ধ (কারণ, যে স্থানে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল তার নাম ছিল ইয়ামামা)। বীরত্ব ও শৌর্যপূর্ণ লড়াই করা সত্ত্বেও মুসলিম সেনাদল বেশ ক'দফাই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে নিপতিত হয় এবং তখন নতুন নতুন সমরকৌশলের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কতিপয় সাহাবী প্রস্তাব করেন যে, মুসলিম সেনাদলের মধ্য থেকে যারা কুর'আন মুখস্থ জানেন (অর্থাৎ, হাফেজে-কুর'আন) তাদেরকে নিয়ে একটি পৃথক ও বিশেষ মর্যাদা-সম্পন্ন রেজিমেন্ট গঠন করতে হবে যারা মুসায়লামাকে আক্রমণ করবে। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এটা ভাবা হয়েছিল যে, মুসলিম সেনাদলের অবশিষ্টাংশ, যা গঠিত হয়েছিল তুলনামূলকভাবে নও-মুসলিমদের দ্বারা, তারা জেহাদের পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে নি। আর বিশেষভাবে হুফ্‌ফাজদের দ্বারা গঠিত এলিট রেজিমেন্টটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দুর্দান্ত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। তিন হাজার হুফ্‌ফাজের এই বিশেষ বাহিনীটি মুসায়লামার বাহিনীকে এমন কৌশলী ও প্রচণ্ড আক্রমণ করে যে, পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে চূড়ান্ত

বিজয় দান করেন। আর এই যুদ্ধে মুসায়লামা মারা যায় হযরত ওয়াহসি ইবনে হার্ব-এর হাতে। (ইসলাম গ্রহণের আগে এই ওয়াহসি ইবনে হার্বের হাতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াস্‌সাল্লামের চাচা হযরত হামজা শহীদ হয়েছিলেন)। মুসায়লামার মৃত্যুর এই স্থানটি পরবর্তীকালে "মৃত্যুর বাগান" নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই যুদ্ধের ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল তা হলো সেই তিন হাজার হুফ্‌ফাজের মধ্যে প্রায় পাঁচশত জন শাহাদৎ বরণ করেন। নিত্য নতুন যুদ্ধে ক্রমাগতভাবে এবং অবধারিতভাবে হাফেজদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন হযরত উমর (রা.)। তাই তিনি পরামর্শ দেন যে, কুর'আনের আয়াতগুলো একটি পুস্তকাকারে সংকলন করা এখন খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। মহানবী (সা.) এই কাজটি স্বহস্তে সম্পাদন করেন নি, তাই প্রথম প্রথম আবু বকর (রা.) ইতস্তত করছিলেন। যাহোক, তিনি (রা.) সম্মত হলেন এবং এই কাজ শুরু করলেন। এই কাজে তিনি হযরত যায়িদ বিন সাবিতকে (রা.) নিয়োজিত করলেন। যারা কুর'আন তেলাওয়াত করতো তাদের কাছ থেকে শুনে তা লিখতে লাগলেন যায়িদ (রা.)। এছাড়া তিনি অন্যান্য বিভিন্ন বস্তুতে উৎকীর্ণ, এমনকি মানুষের গায়ে উল্কি হিসেবে অঙ্কিত আয়াতগুলোও কাগজে কপি করতে লাগলেন। এই মহা-ব্যাপক কাজের গুরুত্ব ও ওজন বোঝাতে গিয়ে হযরত যায়িদ (রা.) বলেন:[৫২]

"আল্লাহ্‌ যদি আমাকে পাহাড়গুলোর কোনো একটি সরানোর দায়িত্বও দিতেন তবুও তা এত বড় দায়িত্বের বোঝা হতো না, যা আমাকে তারা দিয়েছে কুর'আন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে।"

কুর'আনের আয়াতগুলো একটি বইয়ের আকারে সংকলন করার কাজটা অনেক বড় ধরনের অর্জন ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) এই কাজের মাধ্যমে অপরিমেয় আশিসের ভাগী হয়েছেন। এই উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লা তাকে সম্মান দান করেছেন। কারণ, কুর'আন প্রকাশনার ফলে কোটি কোটি লোক উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে ইনশা'আল্লাহ্‌।

মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানের পর হযরত আবু বকর এবার একটি রক্ষণাত্মক সমর-কৌশল তৈরির পদক্ষেপ নিলেন। এর দ্বারা মুসলিম শাসনাধীন ভূ-খণ্ডগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সীমান্তবর্তী শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ছিল উদ্দেশ্য। এই

পদক্ষেপের প্রথম অংশ হিসেবে তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠালেন দক্ষিণ-পশ্চিম ইরাকে এবং দ্বিতীয় সেনাদলটি পাঠালেন তিনি উত্তর-পূর্ব ইরাকে। এর নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াদ ইবনে ঘানাম। এই সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, সমর-কৌশলের দিক দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের লোক। আল-তাবারিতে দেখা যায়, হযরত আবু বকর (রা.) এই দুই জেনারেলকে অত্যন্ত খোলাখুলি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ইরাকে তাদের দু'জনেরই দায়িত্ব ছিল ইরানী/পার্সীদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা। তিনি (রা.) বলেছেন, মুসলমানদের তরফ থেকে শত্রুদের প্রতি কোনো আগ্রাসী আচরণের সূচনা করা যাবে না। এর বিপরীতে নন-মুসলিমদের হৃদয় জয় করতে করতে অগ্রসর হতে হবে। ইতিহাসের পাতায় কি এমন কোনো সেনাদলের উল্লেখ দেখা যায়? যাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তলোয়ার এক পাশে সরিয়ে রেখে শত্রুদের হৃদয় জয় করতে?

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে তিনি (রা.) এই নির্দেশও দিলেন যে, যে-সব লোক ইসলাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে যেন সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা না হয়। কারণ, ঈমানের পরীক্ষায় তারা অনেক বড় দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে। এখন হয়তো তারা সেনাবাহিনীর জন্যও বড় বিপদ হয়ে দেখা দিবে। হযরত আবু বকর যেভাবে বলেছেন, সেনাদল দু'টি সে অনুসারেই কাজ করলো। আর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এই দুইটি সেনাদলের সমন্বিত বাহিনী ইরানী আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হলো এবং সমগ্র ইরাকের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করলো। এই মহা বিজয়ের পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিলেন। তদস্থলে দায়িত্ব দিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা ও কমান্ডার হযরত আল-মুসান্না ইবনে হারিসা আল শায়বানি (রা.)-কে। তার দায়িত্ব ছিল অত্যাচারী শাসকের করতলে পুনরায় পতিত হওয়া থেকে ইরাককে রক্ষা করা।

এরপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে (রা.) নতুন একটি সেনাবাহিনীর জেনারেল করা হয়। নতুন এই দলটিকে বলা হয় আল-শামের সীমান্তে গিয়ে অবস্থান করতে। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় রোমান-শাসিত আল-শামের শাসক হুমকি দিয়েছিল যে, একদিন সে মদীনা আক্রমণ করবে। তাই আত্মরক্ষার জন্য সেই সীমান্তে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা জরুরি ছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদকে (রা.) কঠোরভাবে বলা হয়েছিল তিনি যেন সীমান্তে অবস্থান করেন; কিন্তু,

শত্রুপক্ষ আগ্রাসন না করা পর্যন্ত যেন মুসলিম সেনাবাহিনী লড়াই শুরু না করে। যে রোমান-শাসক ইতোপূর্বে মদীনা আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল, অনতিবিলম্বে সে হযরত খালিদের সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালায়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন 'সাইফুল্লাহ্' বা আল্লাহ্ তা'লার তরবারি। আল্লাহ্র ফজলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হারতে অভ্যস্ত ছিলেন না। এভাবে মুসলমান সেনাদল সাফল্যের সঙ্গে আল-শামের আরব গোত্রগুলোকে পরাভূত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান সৈন্যদের দৃঢ়তা দেখে এরা বিক্ষিপ্তভাবে পালিয়ে যায়। এই সময়টি ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিপত্তিময়; এই সময়েই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের ছেলে শাহাদতবরণ করেন। আর ইত্যবসরে আল-শামে রোমান বাহিনী আরো শক্তি সঞ্চয় করে। ফলে হযরত আবু বকর (রা.) অনুভব করেন যে, আরও শক্তিশালী নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তখন তিনি তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের নিয়ে একটি মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা করেন। সেখানে সম্ভাব্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বহু চিন্তা-ভাবনার পর হযরত আবু বকর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদকে অন্য একটি প্রদেশের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি (রা.) আরো সিদ্ধান্ত নেন যে, আল-শামে চারটি সেনাবাহিনী পাঠানো দরকার। এগুলোর নেতা হিসেবে হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান, হযরত সুরাহবিল ইবনে হাসানাহ, হযরত আবু উবায়দা ইবন আল জাররাহ এবং হযরত আমর ইবন আল আস-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের মূল কাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন। সেটি হলো, রোমান সাম্রাজ্যের আগ্রাসন প্রতিহত করা। রোমানরা তখন আল-শাম অঞ্চলে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থান গ্রহণ করে অবস্থান করছিল।

কিছুদিন পর মুসলিম সেনাদল চারটির চার নেতা রোমানদের কঠোর আক্রমণে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। তারা চারজনই তখন হযরত আবু বকরকে (রা.) চিঠি লিখে অনুরোধ করেন যেন তাদেরকে পুনঃশক্তি [রি-ইনফোর্সমেন্ট] যোগানো হয়। হযরত আবু বকর (রা.) অবিচল থাকেন এবং তাদের প্রত্যেককেই স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে বলেন, রোমানদের তুলনায় তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে মুসলমান সৈন্য দ্বারা আশীসমণ্ডিত করেছেন, যারা সকলেই আল্লাহ্র খাতিরে জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই প্রাধান্য দেন। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য অনুসারে আবু বকর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কল বা পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। তিনি পুনরায় সেই চার জেনারেলকে তিরস্কার করেন এবং বলেন:[৫৩]

“নিশ্চয়ই তোমাদের মতো লোকেরা পরাজিত হতে পারে না, যদিও তোমরা স্বল্প-সংখ্যক। যখন লাখো সৈন্য একত্রিত হয়, তারা শুধুমাত্র হেরে যায় তাদের পাপের জন্য। তাই, তোমরা পাপকর্ম থেকে বাঁচো; তোমরা ইয়ারমুকে একত্রিত হও, যেন তোমরা একে অপরকে সহায়তা করতে পার। তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে নামাজ পড়, তোমরা ইমামতি কর।”

অধিকতর শক্তিশালী রক্ষণাত্মক রণকৌশলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে হযরত আবু বকর (রা.) চারটি সেনাদলকেই ইয়ারমুকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলেন। এছাড়া তিনি একটি হুকুম জারি করলেন যার ফলে আল-শামের সর্বত্র শিহরণ বয়ে গেল। তিনি (রা.) আল্লাহ্‌র তরবারি (সাইফুল্লাহ্) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে (রা.) অতিসত্বর ইরাকের দায়িত্ব ছেড়ে আল-শামে সম্মিলিত মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে বললেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ তদনুসারে কাজ করলেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রোমানদের পর্যুদস্ত করলেন আজনাদায়েন এবং ইয়ারমুকে, যদিও তার রসদ অনেক কম ছিল এবং শত্রুপক্ষের সেনাদল মুসলিম সেনাদলের চেয়ে অনেক বড় ছিল। এর পর এমন এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো যেখানে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে তার অসাধারণ রণকৌশল ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করতে হলো। অবধারিতভাবেই মুসলিম সেনাবাহিনী বিজয়ী হলো। আর রোমান সেনাদলের নজিরবিহীন ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হলো।

যাহোক, মুসলমানরা কিন্তু এই বিজয়ে আনন্দিত হতে পারলো না। কারণ, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাদেরকে হযরত আবু বকরের (রা.) মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। এই মৃত্যু-সংবাদ হযরত খালিদের কাছে আগেই পৌঁছেছিল। কিন্তু যুদ্ধরত মুসলিম সেনাদলের হৃদয় ভেঙ্গে যাবে তাদের প্রাণপ্রিয় খলীফার মৃত্যু-সংবাদে, তাই খালিদ (রা.) এটি গোপন করেছিলেন। হযরত আবু বকরের (রা.) সামরিক ক্ষেত্রের অর্জনগুলোকে কোনোভাবেই কম করে বলা যাবে না। তার এসব অর্জনের উপর ভিত্তি করেই তার উত্তরসূরীরা পরবর্তীকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। এখানে প্রদর্শিত মানচিত্রটি[৫৪] লক্ষ করলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তারে তার (রা.) অর্জন উপলব্ধি করা যাবে:

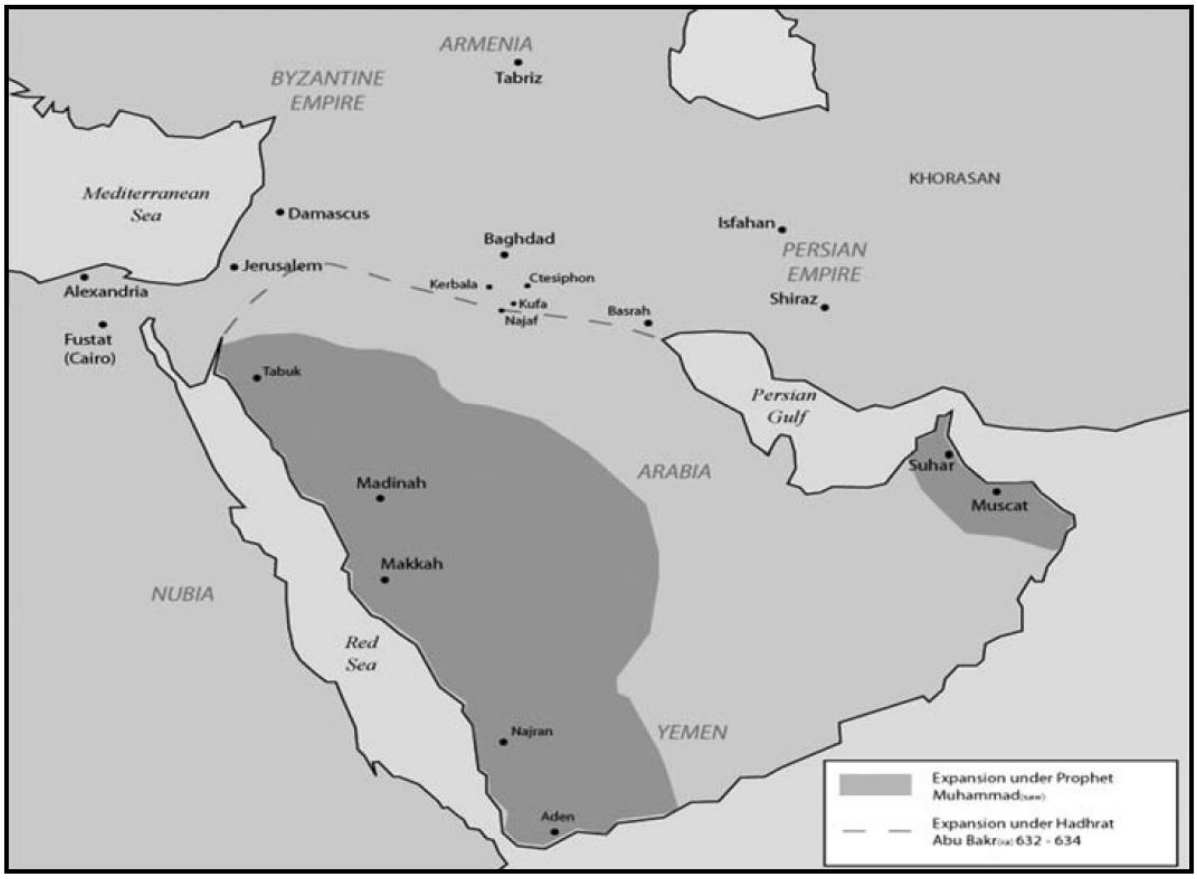

হযরত আবু বকরের (রা.) মৃত্যু

হযরত আবু বকর (রা.) দিনকে দিন অসুস্থ হচ্ছিলেন। তাই তিনি তার পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত উমর ইবনে খাত্তাবকে (রা.) মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অধিকাংশ সাহাবাই (রা.) তার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হলেন এবং বিষয়টি মেনে নিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মারা যান তখন তার ঘরে তার সঙ্গে মেয়ে হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন। তিনি (রা.) আয়েশাকে নির্দেশ দেন, হযরত উমর যেন তার [আবু বকরের] বাগানটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে [ট্রেজারিতে] অর্পণ করেন এবং এভাবে তিনি [আবু বকর] খলীফা হিসেবে বাইতুল মাল থেকে যে সামান্য ক'টি টাকা ভাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেটি যেন পরিশোধ হয়ে যায়। সেদিন মদীনা অত্যন্ত শোকে নিমজ্জিত হলো। শোকের তীব্রতার দিক থেকে এটি ছিল দ্বিতীয়; প্রথম ও সবচেয়ে তীব্র শোক তো ছিল হযরত রসূল (সা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা। হযরত আবু বকরের (রা.) মৃত্যুতে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত, উম্মাদগ্রস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। শোকে, দুঃখে হযরত উমর এতটাই কান্নাকাটি করেছিলেন যে, মেঝেতে যেন একটি ছোটখাটো পুকুর হয়ে গিয়েছিল। এই সংবাদ শুনে হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত শোকাভিভূত হন এবং হযরত আবু বকরের (রা.) ঘরের দিকে রওনা দেন। জনতা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এতে তিনি

হযরত আবু বকরের (রা.) কিছু অসাধারণ অর্জন ও কুরবানির উল্লেখ করেন। অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ এই বক্তৃতায় হযরত আলী নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছেন বলে জানা যায়:[৫৫]

"হে আবু বকর, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। তুমি ছিলে রসূলুল্লাহ্র (সা.) সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাথী। তুমি তার (সা.) স্বস্তির কারণ ছিলে; তুমিই সেই লোক যাকে তিনি (সা.) সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। যদি তার (সা.) গোপন কোনো কথা (বলার) থাকতো, তিনি তা তোমাকে বলতেন। আর তিনি যদি কোনো বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন, তিনি তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করতেন। তোমার লোকদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম ঈমান এনেছো। আর ঈমানের এখলাসের ক্ষেত্রে তুমিই ছিলে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠাবান। অন্য যে কোনো লোকের তুলনায় তোমার ঈমান ছিল শক্তিশালী, যেমনটি ছিল তোমার তাক্ওয়াও। আল্লাহ্র দীন [ধর্ম] থেকে আহরণ করে ধনী হওয়ার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে সবচেয়ে বেশি প্রাচুর্যশালী, *'আজ্জা ওয়া জাল'* (প্রতাপ ও ক্ষমতার অধিকারী)। আল্লাহ্র রসূল (সা.) ও ইসলামের প্রতি তুমিই সবচেয়ে বেশি দরদ রাখতে। সকলের মধ্যে তুমিই ছিলে রসূলের (সা.) শ্রেষ্ঠ সাহাবী। তুমি উত্তম যোগ্যতার অধিকারী ছিলে। তোমার অতীত উত্তম ছিল, তোমার মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। আর তুমি ছিলে তার (সা.) সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। বেশভূষায় ও আচরণে বাকি সবার চেয়ে তুমিই ছিলে রসূলের (সা.) সবচেয়ে নিকটবর্তী ও অনুরূপ। তোমার অবস্থান ও মর্যাদা অনেক উচ্চ ছিল আর মহানবীও (সা.) তোমাকে অন্য সবার চেয়ে বেশি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। [দোয়া করছি] রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও ইসলামের পক্ষ থেকে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। যখন লোকেরা রসূলুল্লাহ্কে (সা.) অবিশ্বাস করেছিল, তখন তুমিই তাকে বিশ্বাস করেছো। সারাটা জীবনব্যাপী তুমি ছিলে তার (সা.) চোখ, যা দিয়ে তিনি দেখেছেন এবং তুমি ছিলে তার কান, যা দিয়ে তিনি শুনেছেন। আল্লাহ্ তার কেতাবে তোমার নাম রেখেছেন 'সত্যবাদী' এভাবে: 'আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে আসে এবং (যে ব্যক্তি) এ (সত্যের) সত্যায়ন করে, এরাই মুত্তাকী।' (সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৩৪ আয়াত)

যখন লোকেরা রসূলুল্লাহ্র (সা.) সহযোগিতা করতে ইতস্তত করেছে, কার্পণ্য প্রদর্শন করেছে, তখন তুমি তাকে আরাম দিয়েছো। আর যখন লোকেরা নিশ্চল হয়ে বসেছিল, তখন তুমি আল্লাহ্র রসূলের (সা.) পাশে দাঁড়িয়েছো এবং তার কষ্ট-কাঠিন্যের সহভাগী হয়েছো। দুঃখ-দুর্দশার দিনে তুমি সত্যিকারভাবেই তার যোগ্য সহচর ছিলে। (সওর) গুহাতে দুই জনের মধ্যে তুমি ছিলে 'দ্বিতীয়' এবং 'আস-সাহিব', আর তোমার উপরই 'আস্ সকিনাহ' (প্রশান্তি) নাজেল

হয়েছে। (মদীনায়) হিজরতের সময়েও তুমি তার (সা.) সহচর ছিলে। আর আল্লাহ্‌র দীন ও তার (সা.) জাতির উত্তরাধিকারী ছিলে তুমি। আর যখন লোকেরা মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছিল, তখন তুমি ছিলে যোগ্য ও সত্যিকারের উত্তরসূরী। তুমি যে কাজ সম্পাদন করেছো তা ইতোপূর্বে আল্লাহ্‌র কোনো খলীফাই করতে পারেন নি। তুমি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়েছিলে যখন তার (সা.) অন্য সাহাবারা মুষড়ে পড়েছিল ও ভেঙ্গে পড়েছিল। তুমি ঠিক তেমনি, যেমনটি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছিলেন: দৈহিকভাবে দুর্বল কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমের ক্ষেত্রে সবল, স্বীয় সত্তায় বিনয়ী কিন্তু আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ স্থানের অধিকারী; জনগণের চোখে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সম্মানিত এবং তাদের হৃদয়ে মহান স্থানের অধিকারী। তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে তোমাকে অপছন্দ করে, তোমার প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণা পোষণ করে ...। দুর্বল ও অসহায়দের তুমি সর্বদাই সবল ও সম্মানিত হিসেবে বিবেচনা করেছো এবং তাদের ন্যায্য পাওনা প্রদান করেছো। আর এক্ষেত্রে তুমি তোমার আত্মীয় এবং অচেনা ব্যক্তিদেরকে সমান চোখেই দেখেছো। লোকদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য বেশি করেছে এবং তাক্‌ওয়াশীল ছিল তাদেরকে তুমি সম্মান করেছো। সামগ্রিকভাবে, তোমার চরিত্র সত্য এবং ভালোবাসার মূর্ত রূপ ছিল। তোমার বক্তৃতায় সর্বদাই প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত থাকতো। ভদ্রতা ও দৃঢ়তার মাঝে অপূর্ব সমন্বয় করে দেখিয়েছো তুমি। তোমার জ্ঞানের ভিত্তি সর্বদাই ছিল জ্ঞানের উপর এবং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সর্বদাই তুমি দৃঢ়চিত্ত ও স্থিরসঙ্কল্প ছিলে সেগুলো বাস্তবায়নে ...। সুনিশ্চিতভাবে, আমরা আল্লাহ্‌রই, তার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা খুশি এবং মাথা নত করছি। এবং আল্লাহ্‌র কসম, হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মুসলমানদের প্রতি এ রকম বিপর্যয় আর কখনও অবতীর্ণ হয় নি যা তোমার মৃত্যুতে হয়েছে। এই ধর্মের জন্য সর্বদাই তুমি রক্ষাকারী ছিলে, আশ্রয়স্থল ছিলে এবং সম্মানের কারণ ছিলে। আল্লাহ্‌ তোমাকে তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে একত্রিত করে দিন। আর তোমার পুরস্কার থেকে যেন আমাদের বঞ্চিত না করেন। আর তোমার পর যেন তিনি আমাদেরকে বিপথগামী হতে না দেন।”

এই ভালোবাসাপূর্ণ বক্তব্য থেকে শুধু হযরত আবু বকরের (রা.) সুমহান অর্জনের তাৎপর্যই পরিস্ফুট হয় নি; বরং, এর মাধ্যমে তার (রা.) প্রতি সাহাবাদের অপরিসীম ভালোবাসা ও উচ্চ ধারণার কথাও ফুটে উঠেছে। এই পর্যায়ে এসে আমরা তার খেলাফতের সবচেয়ে বিস্ময়কর

দিকটির কথা উল্লেখ করবো। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে খলীফা হিসেবে তার যে সাফল্যের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দশ বছরে অর্জিত হয় নি, বিশ বছরেও নয়, এমনকি ত্রিশ বছরেও নয়; এগুলো অর্জিত হয়েছে মাত্র দুই বছর ও গুটি কতক মাসে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাদে আর কোনো রাষ্ট্রনেতা বা ধর্মনেতা এতো স্বল্প সময়ে এ রকম সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তার প্রতি আল্লাহ্ যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তা তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তার মিশন সুসম্পন্ন করেছিলেন। [পরবর্তী খলীফা] হযরত উমরের (রা.) হাতে তিনি এমন একটি আধ্যাত্মিক জামা'তকে তুলে দিয়ে গেছেন, যা সুস্থির, একতাবদ্ধ, অত্যন্ত বিস্তৃত এবং সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ্‌র প্রতি 'মদীনাওয়ালা ভালোবাসায়' পরিপূর্ণ। কোনো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যদি কেউ হযরত আবু বকরের (রা.) চরিত্রকে এক কথায় বর্ণনা করতে চান, যা থেকে তার পরবর্তী লোকেরা উপকৃত হয়েছে, তাহলে সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি তার পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। [তার জীবদ্দশায়] উম্মতের উপর এমন কোনো বিপর্যয় আপতিত হয় নি যখন হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করেন নি যে, আল্লাহ্ তা'লা যে কোনো বিপদ দূর করতে পারেন। একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়, সম্ভবত একটি ঘটনায় আবু বকর আতঙ্কিত হয়েছিলেন। এটি হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর হিজরতের ঘটনা, যখন কিনা তারা দু'জন সওর গুহায় অবস্থান করছিলেন আর শত্রুরা তাদের খোঁজে একেবারে নিকটে এসে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লা তার প্রিয় সিদ্দিক বান্দা হযরত আবু বকরের হৃদয়ে প্রশান্তি নাজিল করেছিলেন।

৬৩ (তেষট্টি) বছর বয়সে হযরত আবু বকর (রা.) পরলোক গমন করেন। তাকে দাফন করা হয়েছে তার প্রিয় নেতা, পরামর্শদাতা ও পৃষ্ঠপোষক, তার প্রেমাস্পদ হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর কবরের পাশে, একই কক্ষে, রসূল (সা.)-এর কাঁধ বরাবর। এখানে মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস[৫৬] উল্লেখ করা সমীচীন হবে, যা থেকে আমরা অশেষ সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভ করতে পারবো:

"তোমার জন্য, আবু বকর। আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এখানে একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। আমিরুল মুমেনিন হযরত উমর (রা.)-এর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)। তিনি বলেন, পেছন থেকে এক ব্যক্তি তার কাঁধে কনুই রেখে বলে:[৫৭]

"হে উমর, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। আমি সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা করেছি, আল্লাহ্ তোমাকে তোমার দুই সঙ্গীর সঙ্গে রাখুন। কারণ, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রায়ই বলতে দেখেছি, 'আমি, আবু বকর ও উমর (কোথাও) ছিলাম। আমি, আবু বকর ও উমর (কিছু) করেছি। আমি, আবু বকর ও উমর রওয়ানা হয়েছি।' তাই আমি আশা করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তোমাকে তাদের দু'জনের সঙ্গে রাখবেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, লোকটি কে তা দেখার জন্য তিনি ঘুরে তাকান। তিনি দেখতে পান যে, এটি আর কেউ নন, এটি 'জ্ঞানের দরজা' হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে, মসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কবরের পাশে, তার (সা.) দুই কাঁধের সঙ্গে অবস্থিত সেই কবর দু'টি, যা কিনা তার (সা.) দুই বিশ্বস্ত সাহাবীর।

উপসংহার

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। আর স্বীয় জীবনে কুর'আন রূপায়ণের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর পরে তাদের মধ্যে আবু বকরই (রা.) অগ্রে ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন ঐশী বাণী ও কাশ্ফ-এর মাধ্যমে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অনুগৃহীত ছিলেন। তাকে (আ.) আল্লাহ্ তা'লা কাশ্ফযোগে মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের জীবন ও চারিত্র্য সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অনুপম জ্ঞান দান করেছেন। [কাশ্ফী জগতে] বিভিন্ন উপলক্ষেই তিনি (আ.) ইসলামের এসব মহান দূতদের কয়েকজনের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ লাভ করেছেন এবং তাদের কষ্ট-কাঠিন্য অনুভব করেছেন। তাই তার (আ.) কথা অসাধারণ মূল্য রাখে এবং প্রকৃত সত্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। আমাদের প্রিয় হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে লিখতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মন্তব্য করেন:[৫৮]

"তিনি (রাঃ) [হযরত আবু বকর (রা.)] একজন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী, নম্র স্বভাবসম্পন্ন ও দয়ার্দ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে ও দারিদ্র্যের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন।

অতি ক্ষমাশীল, স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন তিনি, ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেতো। মহানবী মুস্তাফা (সাঃ)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আত্মার সাথে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা এমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল যা তাঁর নেতা আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আচ্ছন্ন করেছিল। রসূলুল্লাহর জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণ ধারায় তিনি নিজেকে বিলীন করেছিলেন। কুরআনের ব্যুৎপত্তি অর্জন ও নবীনেতা, মানবতার গর্ব মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে তিনি সব মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশী রহস্যাবলী যখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি ইহজাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে ও দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে প্রেমাস্পদের রঙে রঙ্গীন [রঙিন] হয়ে যান এবং শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে নিজের সব চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন। তাঁর প্রাণ জাগতিক কৌলুষ [কলুষ] থেকে মুক্ত হয়ে এক সত্য ও অদ্বিতীয় সত্তার রঙ্গে [রঙে] রঙ্গীন [রঙিন] হয় আর বিশ্ব প্রতিপালকের সন্তুষ্টির ঐশী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরায় ও হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এবং অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নিল আর তাঁর কথায় ও কাজে [,] ওঠা ও বসায় সে প্রেমের জ্যোতি যখন প্রকাশ পেতে লাগলো তখন তাকে 'সিদ্দীক' নাম দেয়া হলো এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতার পক্ষ থেকে তাকে সতেজ ও গভীর জ্ঞান দান করা হলো। নিষ্ঠা ছিল তাঁর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও একটি সহজাত বিষয়। এর ছাপ ও জ্যোতি তাঁর সব কথা, কাজ, উঠাবসা এবং সব ইন্দ্রিয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রকাশ পেত। আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূর পক্ষ থেকে তাকে নিয়ামতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবুওয়তকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করলে তিনি ছিলেন সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অনুলিপি। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সাহসী লোকদের ইমাম আর নবীদের গুণাবলীর উত্তরাধিকারী ছিলেন।

আমাদের একথাকে তুমি কোন [কোনো] প্রকার অতিরঞ্জন বা ছাড় মনে করবে না, এটি চোখ বুঁজে বলা কথা নয় বা ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টির উপেক্ষার কোন [কোনো] ফলশ্রুতিও [ফলও] নয়; বরং এটি সেই বাস্তব সত্য যা আমার কাছে সম্মানিত প্রভূর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। জাগতিক উপায়-উপকরণের দিকে বেশী [বেশি] মনোযোগী না হয়ে সর্বাধিপতি খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।"

[হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.), 'সির্‌রুল খিলাফাহ', পৃষ্ঠা: ৩১-৩২। দেখুন, বাংলা সংস্করণ (২০০৮), পৃষ্ঠা: ৪৯]

হযরত আবু বকরের (রা.) জীবনী ও অর্জনসমূহের মধ্য থেকে সামান্য অংশই এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। এ যেন মহাসাগর থেকে ক্ষুদ্র এক ফোঁটা পানি তুলে নেওয়া। আল্লাহ্ তা'লার এই মহান প্রেমিক ও দাসের জীবন সম্পর্কে গভীর থেকে গভীরতর চিন্তা-ভাবনা করার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত আমাদের সবার হৃদয়ে। তার (রা.) সুমহান কুরবানির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা প্রকাশ করার সর্বোত্তম উপায় হলো আল্লাহ্‌র কাছে দো'য়া করা: হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের সকলের মধ্যে হযরত আবু বকরের (রা.) স্পিরিট/উদ্দীপনা সঞ্চারিত করে দাও এবং তা সঞ্চারিত করে দাও আমাদের সন্তানদের মাঝেও। আসুন আমরা সবাই আবু বকর (রা.) হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি আমাদের ঈমানের ক্ষেত্রে, ভালোবাসায়, আধ্যাত্মিকতায়, তবলীগে, সাহসিকতায়, ইত্যাদিতে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নির্দেশ দিয়েছেন:[৫৯]

"আমি কেবল এটা জানি, কোন [কোনো] ব্যক্তি মু'মিন এবং মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আবূ বকর, ওমর, উসমান, আলী (রাঃ)-এর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট না হয়। তাদের পৃথিবীর সঙ্গে ভালবাসা ছিল না বরং তারা নিজের জীবন খোদাতাআলার রাস্তায় উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।"

[হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.), 'লেকচার লুধিয়ানা' বাংলা সংস্করণ (২০০০), পৃষ্ঠা নং: ৫১]

(শেষ)

[The Review of Religions, November 2007 অবলম্বনে]

Bibliography

1. *The Holy Qur'an*; With English Translation and Commentary. 1988. Published under the auspices of Hadhrat Mirza Tahir Ahmad. Islam International Publications. Islamabad (England).
2. *Tafsir* Al-Qurtubi, 'Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubil 1965. Daar Ihya At-Turaath Al-Arabee. Beirut.
3. *Sahih Al Bukhari*
4. *Sirrul-Khilafah*, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. 2007. Al-Shirkatul-Islamiyya. Islamabad (England).
5. *The Will*. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. 2004. Islam International Publications. Islamabad (England).

6. *A Misunderstanding Removed*, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. 2007. Islam International Publications. Islamabad (England).

7. *Tadhkirah; Compilation of the Dreams, Visions and Verbal Revelations of Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad*, Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan. 2006. Islam International Publications. Islamabad (England).

8. *Lecture Ludhiana*, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. 2003. Islam International Publications. Islamabad (England).

9. *Introduction to the Study of the Holy Qur'an*. Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad. 1989. Islam International Publications. Islamabad (England).

10. *Murder in the Name of Allah*, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad. 1989. Lutterworth Press. Cambridge.

11. *As-Seerah An-Nabawiyya. Maktaba As-Safa* Abi Mohammad Abdul Malik Ibn Hishaam Al-Ma'afirj. 2001. Cairo.

12. *Biography of the Prophet*, Abdus Salam Harun. 2000. Sirat Ibn Hisham; Al-Falah Foundation. Cairo.

13. *Tarikh At-Tabari; Tarikh Al-Umam wal-Muluk*, Abi Ja'afar Mohammad ibn Jareer At-Tabari. 2003. Dar Sader. Beirut.

14. *The History of the Khalifahs who took the right path*, Imam Jalal ad-Din as-Suyuti. 2006. Ta-Ha Publishers Ltd. London.

15. *Al Bidaayah Wan-Nihaayah*, Abul-Fidaa Al-Haafidh ibn Katheer Ad-Dimashqee. 1988. Al Bidaaya Wan-Nihayya. Daar Ar-Rayyaan. Cairo.

16. *Lataaif al-Ma'aarif*, Ibn Rajab al-Hanbali

17. *Muhammad; Seal of the Prophets*, Muhammad Zafrullah Khan. Routledge & Keagan Paul. London.

18. *The Biography of Abu Bakr As-Siddeeq*. Dr 'Ali Muhammad Muhammad As-Sallaabee. 2007. Darussalam. Riyadh.

19. *The Political and Military Leadership of the Prophet Mohammad*. Ahmad Rateb Armoush. 1997. Dar An-Nafaes. Beirut.

20. *Selected Friday Sermons*. 'Abdul Malik Mujahid. 2000. Darussalam. Riyadh.

21. *Historical Atlas of the Islamic World. Oxford University Press*. Malise Ruthven & Azim Nanji. 2004. Oxford.

References

[১] *Al-Suyuti, The History of the Khalifas*, p. 47

[২] *Al-Suyuti,* p. 14; At-Tirmidhi in Al-Manaaqib 3679.

[৩] *Sahih Al-Bukhari,* Vol.5. Ch.57. No.24.

[৪] Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. *Sirrul Khilaah.* P.8-9; also see *Tadhkirah.* P317.

[৫] Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. *A Misunderstanding Removed,* p.4. [হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, এক গলতি কা ইজালা (একটি ভুল সংশোধন), দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ (অক্টোবর, ২০০১), পৃষ্ঠা: ৫]
[৬] Hadhrat Khalifatul Masih II, *Tafsir Al-Kabir,* p.387. Ft. 1186
[৭] The Holy Qur'an, Ch.9 Vs.40
[৮] Al-Bukhari, 3661
[৯] Taken from Rateb Armoush, *The Political and Military Leadership of the Prophet (saw) Muhammad.* p.40; Original source Hamidullah. Majmu'at al-Watha'eq p.257
[১০] Ibn Hishaam, p.3.
[১১] As-Sallaabee, p.108.
[১২] IBID Pg.17.
[১৩] *Al-Suyuti.* p.18.
[১৪] *Introduction to the Study of the Holy Qur'an*, p. 144-45.
[১৫] The Holy Qur'an. Ch.4:V.126.
[১৬] Khalifatul Masih II, *Tafsir Al-Kabir.* Ft.261; Original Source Aqrab & Lane.
[১৭] IBID Ft.591.
[১৮] *Al-Suyuti,* pp.41-42; Also see *Sahih Al-Bukhari,* Vol.5, Bk.57, No.13.
[১৯] Hadhrat Khalifatul Masih II. *Tafsir Al-Kabir.* Ft.261.
[২০] *Al-Suyuti,* p.47.
[২১] IBID. Pgp.34.
[২২] Ibn Hishaam. 1/393
[২৩] *Al-Suyuti.* p.26.
[২৪] Muhammad Zafrullah Khan. *Muhammad; Seal of the Prophets.* p.61.
[২৫] *Al-Suyuti.* p.26.
[২৬] Muhammad Zafrullah Khan. *Muhammad; Seal of the Prophets.* p.61.
[২৭] *Sahih Al-Bukhari.* Vol.5, Bk.57, No.113.
[২৮] See *Introduction to the Study of the Holy Qur'an* pp. 345-45.
[২৯] *Al-Suyuti.* p.41.
[৩০] *Al-Tabari,* p.513
[৩১] Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad. *Introduction to the Study of the Holy Qur'an.* Pp.298-99.
[৩২] IBID, pp.299
[৩৩] Ibn Rajab. Lataaif al-Ma'aarif, Pp.114.
[৩৪] See *Sahih Al Bukhari, Vol.5, Ch.57, No.19.*
[৩৫] *The Holy Qur'an,* Ch.3:Vs.145.
[৩৬] *Tafseer al-Qurtubi.* 2/222.
[৩৭] Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. *The Will,* p.6.
[৩৮] *Sirrul Khilafah,* p.18; Also see *Tadhkirah. p.317.*
[৩৯] *The Holy Qur'an,* Ch.64: Vs.56.
[৪০] *Sirrul Khilafah,* p.15.
[৪১] Hadhrat Mirza Tahir Ahmad. 17th July 1994. Liqaaa Ma'al 'Arab. http://66.250.64.38/dmlmediafiles/video/wmv/QALQ071794_04.wmv
[৪২] *Al-Sayuti,* p.48.
[৪৩] IBID
[৪৪] *Sahih Al-Bukhari.* Vol.5. Bk.57, No.11.
[৪৫] Al-Bidaayah Wan Nihaayyah. 6/306. 306.
[৪৬] Al-Tabari. 4/45.
[৪৭] IBID 4/46.
[৪৮] Hadhrat Mirza Tahir Ahmad. *Murder in the Name of Allah.* p.67.
[৪৯] IBID, p.69
[৫০] IBID, p.68; Also see *Muhammad Idris al Shafu. Kitab al-Umm. Ed.* Muhammad Zahri al Nadjjar (Cairo, n.d.), Vol. VIII. 256.
[৫১] IBID
[৫২] *Al-Suyuti,* p.70
[৫৩] *Al-Tabari.* 4/211.

[৫৪] Malise Ruthven and Azim Nanji. Historical Atlas of the Islamic World, Map 1. p-29
[৫৫] *As-Sallabee,* pp.737-8; Also see At-Tabsirah. Ibn Al-Jawzee. 1/477-479.
[৫৬] *Al-Suyuti,* pp.41; Also see Sahih Al-Bukhari, Vol.5, Bk.57, No.34.
[৫৭] *Sahih Al-Bukhari,* Vol.5, Bk.57, No.26.
[৫৮] *Sirrul Khilafah,* pp.31-32
[৫৯] Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Lecture Ludhiana, p.64.